নারায়ণ ভারতজ্যোতি শৈলেন ও বিজয় স্মরণ সংখ্যা

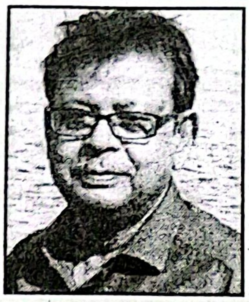
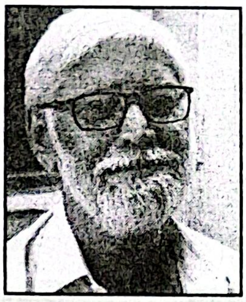

কবি কুমুদকিঙ্কর প্রতিষ্ঠিত

চণ্ডীদাস

✦ ৫১ বর্ষ ৩ সংখ্যা ✦

৭ চৈত্র ১৪৩২ ✦ ২২ মার্চ ২০২৬

সূচিপত্র

স্মৃতিচারণা ঃ
সমরেশ মণ্ডল - ৩
আদিত্য মুখোপাধ্যায় - ৫
নীলোৎপল ভট্টাচার্য - ৭
সুনীল করণ - ১০
অতনু বর্মন - ১৩
জুলফিকার জিন্না - ১৭
আলোক মুখার্জী - ২০
রামানুজ মুখোপাধ্যায় - ২১
রণজিৎ মুখোপাধ্যায় - ২৩
দেবকুমার দত্ত - ২৫
সুজাতা রায় - ২৮
ড. পঙ্কজকুমার মণ্ডল - ২৯
মৌসোনা দাস - ৩০
কবিতা ঃ
অসীম শীল - ১৬
তাপসকুমার চট্টরাজ - ১৯
অরুণাভ সেনগুপ্ত - ৩১

অক্ষরবিন্যাস ঃ আসিফ আহাম্মদ
মুদ্রণ ঃ চণ্ডীদাস প্রেস, দুবরাজপুর, বীরভূম

সম্পাদকীয়

আলোর পথযাত্রী

সমাজ যখন কলুষিত। ঘোর অমানিশায় ডুবে যাচ্ছে গ্রাম শহর। লোভ লালসা আর প্রতিহিংসার আগুনে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছি আমরা। সর্বত্র অসুরের দাপাদাপি। মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা। মানবিক গুণাবলির প্রকাশ যখন ক্রমশ সংকুচিত। রুটি রুজি সৃজনে যখন বাধার পর বাধা। ধর্ম বর্ণ ও জাতপাতে মানুষকে ভাগ করার অভিনব প্রয়াস। কাজের বদলে ভিক্ষাপাত্র ধরিয়ে দেওয়ার নব নব কৌশল। তখন তারই মধ্যে আলোক বর্তিকা নিয়ে যারা সমাজকে উত্তরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে দৃঢ় সংকল্প, সেই অকুতোভয়দের যদি আকস্মিক প্রয়াণ ঘটে। তাহলে শুভ বুদ্ধির উদয় যে থমকে যাবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। গত ২৬ জানুয়ারি থেকে ৪ মার্চ ২০২৬ এই ৩৮ দিনে আমরা হারিয়েছি স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আমাদের জেলা বীরভূমের চার কৃতি সন্তানকে। এরা হলেন - কবি -গায়ক - গীতিকার নারায়ণ কর্মকার, সমাজ পরিবর্তনে জেলার অন্যতম দুই মুখ সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী ও শৈলেন মিশ্র এবং সাহিত্যিক ও নাট্যব্যক্তিত্ব 'রানার' সম্পাদক বিজয়কুমার দাস। এদের প্রয়াণে জেলার মানবাধিকার ও সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলনে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এই আলোর পথযাত্রীদের স্মরণে চণ্ডীদাস পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ। সাহিত্য জগতের বিশিষ্টদের কলমে স্মরণ শ্রদ্ধায় ফুটে উঠেছে প্রয়াতদের জীবনালেখ্য। আশা করি উত্তরসূরিদের প্রেরণা দেবে।

উপদেষ্টামণ্ডলী : আল আফতাব, অজিত চৌধুরী, ফজলুল হক, শান্তিকুমার রজক, রণজিৎ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক : আনারুল হক (৯৪৭৪৭৬৭০৪১), সহ-সম্পাদক : সৈয়দ মৈনুদ্দিন হোসেন (অশোক)(৯৪৩৪১৯৫৫৭২)
প্রচার সচিব : অসীম শীল (৯৮০০৪৫৪৯৩৪) ও মহিউদ্দিন মণ্ডল (৯৪৭৪৮৩১৭০৪)
বিজ্ঞাপন সচিব : বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী (৮৯১৮৬৮৩৬৬৯)
স্বত্বাধিকারী সত্যকাম গোস্বামীর পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক ঠাকুর হরিদাস আশ্রম জয়দেব কেঁদুলি, বীরভূম থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক চণ্ডীদাস প্রেস দুবরাজপুর, পাওয়ার হাউস মোড়, বীরভূম হতে মুদ্রিত।

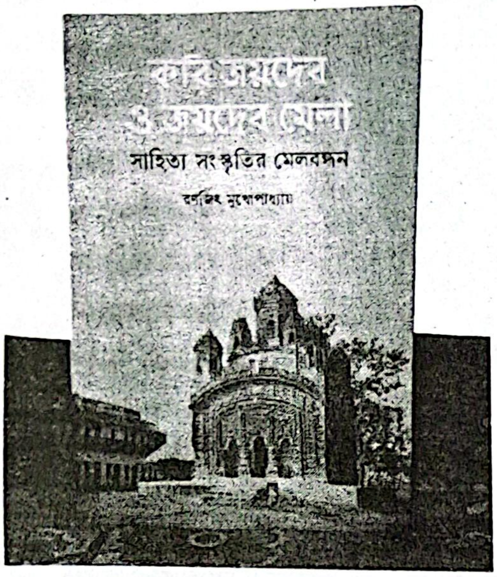

এই মূল্যবান বইটি সংগ্রহ করতে
লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন -
যোগাযোগের মোবাইল নাম্বার -
6294546484

গ্রন্থটি সুঠাম ; 'কলেবর খাটো নয়' বিষয়গত বৈচিত্র্যও সহজেই নজরে পড়ে। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। আলোচনার আবহে কবিরাজ জয়দেব গোস্বামীর শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ থেকে মধুরকোমলকান্তপদাবলী উদ্ধৃত হয়েছে। কুতূহলী ও সংবেদনশীল পাঠকের ঋদ্ধ ওতৃপ্ত হওয়ার কথা। জিজ্ঞাসু পাঠকের কথা ভেবেছেন সহৃদয় প্রবীণ লেখক। তাই শুধু কবি জয়দেব, গীতগোবিন্দ ও জয়দেব মেলা নয়। আলোচ্য সূচির অন্তর্ভুক্ত আরও বহুবিধ আনুষঙ্গিক বিষয়। বাউল প্রসঙ্গ, বুদ্ধাবতারের আরাধনাস্থল ও অজয়নদ তীরবর্তী কবির জন্মভূমির নিকটবর্তী জনপদগুলোর আর্থ-সামাজিক কথা-পরিচয় গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। এ সব বিষয়ে গুণী সাহিত্যবেত্তাদের মতামত ভক্ত ও রসিক পাঠকদের কাছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিকে সমাদৃত করে তুলবে - এ আশা অমূলক নয়।

– দেবকুমার দত্ত, লেখক ও সম্পাদক

এলাহি ভরসা

নিউ হক ফার্নিচার

এখানে আধুনিক ডিজাইনের স্টীলের শোকেশ, আলমারী, আলনা, ছপ্পর খাট পাওয়া যায়।

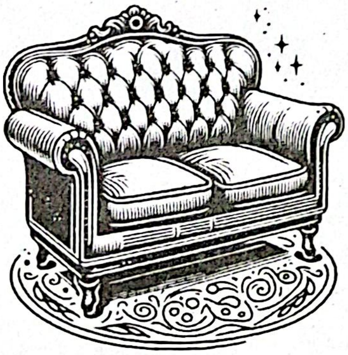

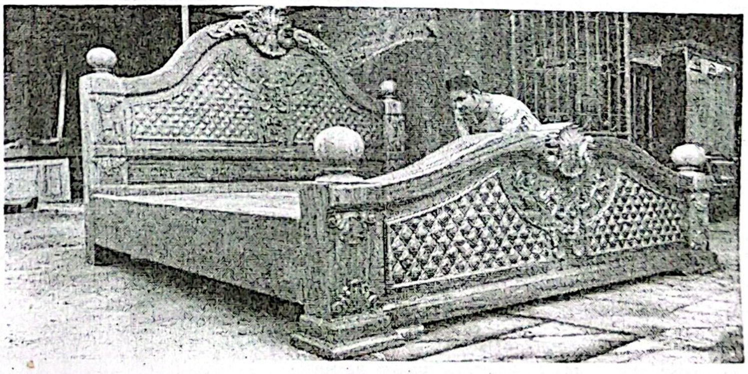

অর্ডার সাপ্লাই করা হয়

জয়দেব-কেঁদুলি, বীরভূম

6295446701

নারায়ণ কর্মকার একজন সত্যিকার পল্লীকবি

সমরেশ মণ্ডল

বেশ কিছু স্মৃতি ভিড় করে আসছে, কোথা থেকে শুরু করব তাই ঠিক করতে পারছি না। পারছি না মানে মুশকিল হয়ে পড়ছে।

দৃশ্য এক পঁচিশে বৈশাখ। নন্দন চত্বর। কৃত্তিবাস পত্রিকা বিক্রি হচ্ছে। সম্পাদক অটোগ্রাফ দিচ্ছেন (ফেসবুক ক্লিক করুন। দেখুন ছবিটি রয়েছে, পিছনে চুলের নারায়ণ কর্মকার, চিনতে কারুর অসুবিধা হবে না।) তারই মাঝে আমরা ক্যালকাটা ক্লাবে যাচ্ছি গলা ভেজাতে। নারায়ণ পিছু নিল। সবাই নিশ্চুপ। আমি বুঝিয়ে বলি তোমার পাজামা পাঞ্জাবি আর চটি। ঐ ক্লাবে তুমি ঢুকতে পাবে না। আমরা ফিরে আসছি। ক্যালকাটা ক্লাব শিল্পী হুসেনকেও ঢুকতে দেয়নি। তা পিছন ফিরে দেখি হাসি মুখ নারায়ণ যেন এটাই হবার। দুঃখ ছোঁয়নি তাকে।

দৃশ্য দুই বাঁশবাগানে ক্লাস হচ্ছে। মধ্যদুপুর। পাশে দাঁড়িয়ে একটি হিরো ম্যাজেসটিক। ক্লাস নিচ্ছেন আশাদা। আশানন্দন চট্টরাজ। সারা দুপুর ভাত খাইনি। গ্রীষ্মের দুপুর। আশাদা দুবরাজপুর থেকে রসগোল্লা আর সেঁওভাজা আনালেন। সদ্য লেখা গানের খাতা থেকে নারায়ণ গেয়ে চলল একের পর এক গান। পছেড়া প্রাইমারি স্কুলের সেই বাঁশবাগানের ক্লাস আজ স্পষ্ট ভাসছে। আশাদা বললেন 'স্যানোলা' কোম্পানিতে ওকে নিয়ে যাও।

দৃশ্য তিন আকাশবাণীতে ইন্টারভিউ নিচ্ছেন স্বয়ং প্রযোজক (এখন তিনি কেন্দ্র অধিকর্তা)। আমরা স্টুডিওতে বসে শুনছি। চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই ভাড্ডি গ্রাম। যার পাশ দিয়ে শাল নদী। বনাঞ্চল ঘেঁষা এই গ্রাম। পাশের বর্ধিষ্ণু গ্রামের হেডমাস্টার যিনি আবার বুদ্ধদেব বসুর ভক্ত। তাঁর মুখ ভেসে আসছে। অসীম শীল নারায়ণের পাশে দাঁড়িয়ে সর্বদা। তার ছবিও ভেসে আসছে।

দৃশ্য চার ভয়েস মাস্টার রেকর্ড করবে নারায়ণের গান। 'জন্মেছি এই গাঁয়ে' নামাঙ্কিত গানের ক্যাসেটে। স্টুডিও পাড়ায় সেই প্রথম পদক্ষেপ। প্রথমদিনের পর দ্বিতীয় দিন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। বাড়ি ফিরছি। ভীত বাউলের এক চোখ দেখেছিলাম সে দিনও।

দৃশ্য পাঁচ বাউল সঙ্গ করব তাই হিরো ম্যাজেসটিক নিয়ে আবার জয়দেব। অসময়ে। দুপুর বিকেল হয়েছে বিকেল সন্ধে হলো। থাকব কোথায়? কেন? কুমুদকিঙ্করের আখড়ায়। আবার সেখানে গান-তত্ত্বজ্ঞান সব চলল। মধ্যরাত্রে ভাত পেঁয়াজ-লংকা। আমিও কদমখণ্ডীর ঘাটে কম্বল ঢাকা নিয়ে বেদম ঘুমোলাম। বাউল কবি নারায়ণ মধ্যরাত্রি পেরিয়ে চাঁদের তরণি ধরণির কোণে ঠেকল যখন তখনো গুনগুন করে চলেছে।

ভোর হয়েছে। কীর্তনের সুরে। আবার সকালে কোলিয়ারি এসে যোগ দিয়েছে কাজে। আমার মস্তিষ্কের কাজ, নারায়ণের শারীরিক পরিশ্রমের কাজ। পাণ্ডবেশ্বরে ছিল মথুরের হোটেল। সেখানেই নারায়ণের সংসার। ইঁদারার জলে স্নান আর দুপুরে ডাইরি খুলে মনের খেয়ালে পাতায় পাতায় রচনার খেলা। তালের রস আসত। মাছভাজা। কোনদিন অসাধারণ রাঁধুনি মথুর আমাদের কত কী যে খাওয়াতো। নারানের খাতায় লেখা হত সব বিল।

দৃশ্য ছয় অনেকেই জানে না কোটাসুর হল বাউলদের পীঠস্থান। তো সেখানেও গেলাম, বাহন সেই হিরো ম্যাজেসটিক। যার প্রতিটি অংশ নারাণের চেনা। যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় সে পারে এটি কার্যকর

করে তুলতে। তা এক বাউল মচ্ছবের দিন গেলাম কোটাসুর। বাউলের ভিড়ে মিশে গেল নারান। আদিত্য মুখোপাধ্যায় তো আশ্রমকর্তা, সন্তু সেনগুপ্তের দক্ষিণ হস্ত। তো, আমরা বেরুলাম দুপুরের পর, গন্তব্য তারাপীঠ। একটি অতি সস্তার হোটেল ছিল নারানের চেনা। সেখানেই উঠলাম। সারারাত শ্মশানে মশানে কেটে গেল। চাটাই বিছানো শোবার ঘরে।

দৃশ্য সাত স্যানোলা কোম্পানি তখন ওঠার মুখে। নারানের গানের খাতা দেখল। বললো আশাদাকে বলবেন কিছু করা গেল না। তবে আকাশবাণীতে আর্য চৌধুরি আছেন। তাঁর কাছে গান জমা দিয়ে আকাশবাণীর গীতিকার তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। পঁচিশ কেন নারায়ণ তখনই ২৫০টি গান জমা দিতে পারে। ড. সুধীরকুমার করণ চিঠি লিখে দিলেন আর্য চৌধুরীকে,নারায়ণ কর্মকার আকাশবাণীর তালিকাভুক্ত গীতিকার হয়ে গেল। শ্রোতার কানে কানে ফিরতে লাগল গীতিকারের নামটি।

দৃশ্য আট 'রাঙামাটির ফসল', নারায়ণ কর্মকারকে সম্বর্ধনা দেবে। স্থান নাকড়াকোন্দা হাইস্কুল। সমস্ত আয়োজন লোকপুর হাইস্কুলের। জ্ঞান দে হেডমাস্টার। নারায়ণের গুণগ্রাহী আবার সমালোচকও বটে। সহজ সরল গ্রামীণ পরিমণ্ডলের ভিতর এক অদ্ভুত ছবি সারাজীবনের জন্য গাঁথা থাকল। ড. সুধীরকুমার করণ ছিলেন এই অনুষ্ঠানের প্রধান পুরুষ। তিনি ফোক সঙ আর ফেক সঙ নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন; বলেছিলেন অংশুমান রায় থেকে শুরু করে সুখবিলাস বর্মা, স্বপ্না চক্রবর্তী আরো অনেকের গানের কথা। নারায়ণ কারোর কথা ভোলেনি। পথে পথে ছড়ানো পাথরের দিকে তার সমান সমগ্রতা কেবল ছুঁয়েই থাকে না। অঙ্গীভূতও হয়ে যায়।

দৃশ্য নয় নারায়ণকে নিয়ে গেলাম প্রতিভাসের অফিস। বীজেশ সাহার হাতে তুলে দেওয়া হল গানের খাতা। কি নাম হবে? বিন্দুমাত্র চিন্তার কিছু নেই; হৃদয়পুরের গান ছাড়া আর কি হতে পারে? ব্যাপকভাবে পরিচিতি লিখতে হবে; আমাকে কিছুমাত্র ভাবতে হল না। প্রতিভাসের ঝকঝকে এসি চেম্বারে আমারই হাত দিয়ে উঠে এল 'হৃদয়পুরের গান' অবিনাশী আত্মার গান। সীমান্ত বীরভূম আর ঝাড়খণ্ড সীমান্তের যে নিবিড় বনজঙ্গলের পাহাড়ি টিলা। এখানে সাঁওতাল, পাহাড়ি ঋক্ষ, চিতার মাঝখানে সহজ সরল মাটির সুরের গান কথারা সুর পায়, সুরের স্বরলিপিতে আপনাআপনি এসে বসে স্বস্থানের কথারা।

দৃশ্য দশ বিখ্যাত কবি সুনীল ক্ষ্যাপাকে তার প্রথমখণ্ড 'হৃদয়পুরের গান' উৎসর্গ করেছে নারায়ণ। তারই গান গাইতে এত বিভোর যে ফ্যানের ঘুরন্ত ডানায় লেগে বিপদ হয়ে যেতে পারত। গানের শেষে বাউল নারায়ণ আছড়ে পড়ল কবির চরণতলে। কবি সুনীল ক্ষ্যাপা ওরফে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আশীর্বাদ করলেন তাকে। যেন একটি লীলা কীর্তনের শেষ হোল।

একে একে নিভিছে দেউটি

আদিত্য মুখোপাধ্যায়

আমি খুব বোকা আছি আজও। যদিও বোকা থাকতেই আমার ভালো। খুলেই বলি বিষয়টি। এই নারান, ভারতজ্যোতিদা, শৈলেন্দ্যদা কোনদিন মরবেনা, এমন ভাবতাম আমি। কিন্তু মরেই তো গেলেন, চলেই তো গেলেন এখান থেকে! আমাদের অন্ধকার আরও ঘন হলো, আরও বাড়ল। 'এমন আলোর মানুষেরা' এখান থেকে চলে গেলে পৃথিবীর আঁধার আরো চেপে বসে। এমনিতেই এখানে এখন মানুষের বেশ অভাব। তার উপর আলোকিত মানুষ, সম্পূর্ণ মানুষ, ভালোবাসার মানুষ তো মেলেই না! আমাদের হাহাকার আর কাকে শোনাব।

কিন্তু যাঁরা চলে যাচ্ছেন, তাঁরা ঠিক আমাদের উপরের সারির। তাহলে কী আমাদেরও বয়স বেড়েছে, আমাদেরও কী চলে যাওয়ার সময় সমাগত। কই দাগ তো রাখতে পারলাম না! ওরা তো সবাই নিজের নিজের নিজের জায়গায় 'দাগ' রেখে গেছে। জায়গা ফাঁকা করে দিয়ে গেছে আমাদের জন্য।

সমরেশ, অসীম শীল, নীলু আমরা সবাই নারায়ণ কর্মকারের ওই গানটিকে বলতাম ' বীরভূমের জাতীয় সঙ্গীত'। অনুষ্ঠানে কোথাও দেখা হলে, জয়দেবের 'ভক্তিভবনে' নারানকে পেলেই বায়না করতাম 'বীরভূমের জাতীয় সঙ্গীতটি' গাও। তার জন্য আনারুল, শান্তিদা, রণজিৎদাদের সুপারিশও করতাম। ওঁরাও আমাদের প্রশ্রয় দিতেন। নারান মনের আনন্দে নেচে নেচে গাইত। 'বীরভূমটাই এক দেশ / এখানে বিশ্বকবি জীবনের সব ছবি এঁকে ধরে বাউলের বেশ / . . . . . মেতে উঠত অনুষ্ঠানের মাটি, শতরঞ্চি পর্যন্ত। যাঁরা যাঁরা ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকত সবারই নাম গানটিতে ঢুকিয়ে দিতো নারান। সে এক অপূর্ব উন্মাদনা। 'এবার গানের কথায় আমার নামটি আসবে।' এমন লোকগায়কের কী মৃত্যু হতে পারে? বলেছিলাম, তাঁর ভাড়ি গ্রামটি একদিন তাঁর নামেই চিহ্নিত হবে। হয়েছে। নারানের গানের কথায় যে মাটির মাদল বাজে তা আর কোথায় মেলে কত্তা! গ্রামীণ চারণ, স্বভাব কবি ও গায়ক নারানের ভেতর একজন অসম্ভব ভালো মানুষ বাস করত। সে অনায়াসে সকলের প্রশংসা করতে পারত। আর বলত, তোমরাই আমাকে তৈরি করেছো। সেই আমাকে বলেছিল পাইগড়ার রেনি ঝুমুরের কথা, শুনিয়েছিল সেই গান - , ' গুঁজে দিয়ে পলাশকুঁড়ি আমার নোটন খোঁপাতে / বলেছিলি ভালোবাসি দাঁড়িন পিয়েলতলাতে '। খয়রাশোল, ভাড়ি, ভীমগড় এলাকার রুক্ষ বসন্তে এমন পলাশ-পিয়াল-মাদার-শিমূল গাছের তলায় তুমিও তো কত কথা দিয়েছিলে শিল্পী, বলেছিলে 'ভালোবাসি'। তথাপি চলে গেলে কেন? এমন ভালোবাসার মানুষ চলে গেলে কী মন ভালো থাকে ? ও বলতে ভুলে গেছি, ভালোবাসার মৃত্যু নেই, মৃত্যু শুধু দেহটির! নারানকে মারতে পারে কার সাধ্যি!

ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরীর বাবা বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলার আসামী, আন্দামান নির্বাসিত প্রদ্যোৎরায় চৌধুরী। তার রক্তে তাই আগুন ছিলই। তিনিও নকশাল আন্দোলনে ব্যাপক কাজ করেছেন বীরভূম জেলায়। রামপুরহাটে জ্যোতি বসুর মঞ্চেই বলেছিলেন 'কৃষকের হাতে বন্দুক চাই'। তারপর নানান ঘাটে জল গড়িয়ে কোটাসুরের কাছে 'চক্ চাঁদনী' তে গোপন ডেরায় । চাষ করতে এলেন ময়ূরাক্ষীর চরায়। কিন্তু পারবেন কেন? চক্রী মানুষের পাল্লায় পড়ে বহু অর্থ জলাঞ্জলি দিয়ে আবারও আর এক ঠেকে। কিন্তু আমার প্রত্যেকটি

বিকেল কাটত তখন তাঁর সঙ্গে, আলাপে-আলোচনায়। শুনতাম ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তান যাওয়ার কথা। হত সাহিত্য আলোচনাও। অতনু বর্মণ তখন থাকত তাঁর কাছেই। অতনুর সঙ্গে আমার সম্পর্কের গভীরতা বেড়েছিল এখানেই। । সাইকেল নিয়ে তন্ন তন্ন করে ঘুরেছি এলাকা, চলে গিয়েছি আমড়া-গণুটিয়ার কুঠিতে। এখান থেকেই প্রথমে 'ভারতজ্যোতি' পরে নাম বদলে বেরিয়েছে 'ইঙ্গিত' পত্রিকা । এমন আদর্শবাদী মানুষ পৃথিবীতেই কম আছে। সোজা মেরুদণ্ডটি কখনও বিক্রি করেননি। অথচ এক সমুদ্র ভালোবাসা দিতে তার কোন কার্পণ্য দেখিনি! তাঁর সঙ্গেই গেছি আলোকদা, অপরাজিতাদির কাছে। ত্রিশূলাপট্টীর চালকলের ছোট্ট ঠিকানায়। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন। আর ভালেবাসার তো মৃত্যু হয়না, হতে পারেনা।

শৈলেন মিশ্র নামটি শুনেই একসময় ভয় পেতাম, সমীহ করতাম তাঁকে। তারপর যখন মুখোমুখি পরখ করলাম, তখনই দেখতে পেলাম ওঁর ভেতরে একটি শিশু আছো । যে শিশু স্মিত-চাপা হাসির সঙ্গে হা-হা হাসিতে ভেঙে পড়তে পারেন । মানুষকে ভালোবাসতে পারেন। কোনো অহং নেই, ক্ষমতার দর্প নেই। আমি 'শৈলেন মিশ্র', এমন নামের বড়াই নেই! কী আছে তবে তাঁর মধ্যে? শিশুর সারল্য আর অন্যকে তুলে ধরার, বড়ো করার হৃদয়। এবং মানুষকে ভালোবাসর মন। তাঁর দাদু বাইরে থেকে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন গড়ে ওঠার কালে। দাদুকে খুব ভালেবাসতেন শৈলেনদা। তাঁর মধ্যে খুঁজে পেতেন বড়ো মানুষের সমস্ত লক্ষ্মণ। নিজের আদর্শ ভাবতেন তাঁকে। তাঁকে নিয়ে শান্তিনিকেতনের 'বইওয়ালা বুক ক্যাফে' থেকে একটি ছোট বইও বের করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে থেকে কোনোদিন সেই শুভ্র- আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা শিশুটিকে আমি হারিয়ে যেতে দেখিনি। তবে এখন তিনি হারিয়ে গেলেন কেন? সেই অবিসংবাদী নকশাল নেতা শৈলেন মিশ্র! এরা হারিয়ে যেতে পারেন না। এঁরা জীবনে মানুষকে ভালেবেসে গেছেন। সুতরাং মানুষের মাঝেই তাঁরা থাকবেন। ভালোবাসা ছাড়া পৃথিবীতে তো আর কিছু নেই, কিছুই নেই। কাজেই তাঁদের দেহ'জ মৃত্যু হলেও আলো-আকাশ- বাতাস-মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁরা মিশে আছেন। । তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়ী, তাঁদের মৃত্যু নেই। মানুষকে ভালোবেসেই তাঁরা অমর। প্রত্যেকেরই অল্প-বিস্তর লেখা রয়েছে, সেগুলো পড়লেও আমাদের সুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

এই অন্ধকার জগতে তোমরা তিনজনে ভালোবাসার আলোর উৎস, তোমাদের মারবে কে ? তোমাদের মৃত্যু নেই । জগতে ভালোবাসাই থাকে, আর সবারই মৃত্যু হয়। নারান, জ্যোতিদা, শৈলেনদা তোমরা জীবনের ভালোবাসায় উত্তীর্ণ। তোমাদের স্মরণ করি, তোমাদের প্রণাম করি। অন্ধের মতোই, বোকার মতোই খুঁজতে থাকি তোমাদের, কোনোভাবেই হারিয়ে ফেলতে পারিনা!

হারিয়ে গেল হৃদয়পুরের গান

নীলোৎপল ভট্টাচার্য

ঢং ঢং ঢং । থেকে থেকে নিজ দায়িত্বে ঘন্টা বাজাচ্ছে সচেতন সময় । সেই ঘন্টার শব্দ শুনে চমকে উঠছি আমরা । কেউ ভাবছি, কেউ ভাবছি না। যারা ভাবছি তারা জানি, বেলা চলে যাচ্ছে । বেলা মানে আয়ু । আমরা কি কখনো লালাবাবুর মতো হতে পারি ?
মুহূর্তে আমাদের মনবদল করে দিতে পারে কি দিনভিখারির হাঁক ?

যাক , সেকথা থাক । আমরা জানি , যে কোনদিন আমরা হাতে পাবো চলে যাবার
মন খারাপ করা মহানোটিশ । জীবন স্মরণিকা থেকে একদিন টুক করে নাম কাটা যাবে আমাদের । ভাবলে মন খারাপ হয় ।
না ভাবলে কিছুই নয় । জানি , জান্তে অজান্তে
যাবতীয় সৃষ্টিরেখা ছুঁয়ে একা একাই চলে যাবে সময় । আমাদের দেহতরী একে একে ডুবে যাবে মৃত্যুনদীতে ।

জয়দেব কেন্দুলির প্রিয় আউল বাউলরা, দাদারা , বন্ধুরা , সবকিছু শূন্য করে , অনেক জীবনস্মৃতি রেখে চলে গেছে একে একে । জীবনের সিংহদরজায় ধাক্কা মারছে মৃত্যুর স্রোত । ওই স্রোতের ভিতরে হাঁ করে আছে এক মৃত্যুমকর ।

সবার আগে, প্রশান্ত দা, বাউল ও লোকসংস্কৃতি প্রিয় প্রশান্ত রায় । আমার একান্তআত্মিক বৃত্তে থাকা প্রিয় পরিচিতদের মধ্যে তমালতলার তমালবৃক্ষ সুধীরদা , সুধীর ক্ষ্যাপা । বটবৃক্ষের ছায়াজাগানিয়া পথের বাউল দীনবন্ধু দাস । তারপর একে একে আশা দা, বাউল কবি আশানন্দন চট্টোরাজ । ' অচিন পাখির'র দেবকীদা , দেবকী বন্দোপাধ্যায়। কেন্দুলি অন্তপ্রাণ বিশিষ্ট বাউল গবেষক ।
শকুন্তলা সম্পাদক অমিত দা , কবি অমিত গুপ্ত। চিন্তামণি মা । রামানন্দ ক্ষ্যাপা আড়ংঘাটার সুবল দাস গোঁসাই । বাউল তারক ক্ষ্যাপা । কালাচাঁদ দরবেশ । ধনঞ্জয় দাস বাউল । জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাত অধ্যাপক, বাউল প্রেমরসিক চিত্রবাণীর দীপক মজুমদার।
মনের মানুষ আখড়ার সাধন'দা , সাধন দাস বৈরাগ্য । জাতীয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র খ্যাত এই গুরু গোঁসাই, বাউল বৈষ্ণবকে ভালোবেসে আমি দাদাই ডাকতাম
স্মৃতি তালিকায় আরো কিছু নাম । ভাবসাগর বাউল বিশুদা , বোলপুর শুঁড়িপাড়ার প্রিয় বিশ্বনাথ দাস বাউল চলে গেছেন সময়ের শিকড়ে স্মৃতির আজলা ঝোলা ফেলে রেখে । চলে গেছেন ফকির বাউল আখড়ার প্রাণশিকড় বাউল বন্ধু বেনীমাধব দাস গোঁসাই । চলে যাওয়ার তালিকাটি খুব দীর্ঘ । গৌর ক্ষ্যাপাও একদিন জীবনের পাততাড়ি গুটিয়ে এখন হয়ত জমিয়ে ছিলিম সাজাচ্ছেন স্বর্গের কোন এক বাউলবাগানে কিংবা সুরমগ্ন কোন এক পাগলা কুটিরে ।
মন জুড়ে মৃত্যু স্মরণিকা । যোগে বিয়োগে জড়িয়ে আছে আরো অনেক প্রিয় নাম অনেক নাম । না, এখানেই শেষ নয়, শূন্যতার শোক পরিধি । বড়ো দীর্ঘ, মনখারাপ করার এই মৃত্যু পাঁচালি।

সবার সেই পলাতক মুখ মনে পড়ছে আর ব্যথায় ব্যথায় মোচড় খাচ্ছে আমার বুক । চলে গেছে প্রতিশব্দ সম্পাদক আমার দীর্ঘ দিনের কেদুলিসঙ্গী মনমাতাল কবিবন্ধু প্রিয় শৌভিক, শৌভিক চক্রবর্তী । অনন্ত আগুন আচমনে জেগে থাকা জিগরিদোস্ত, ছড়াকার কবি দীপ মুখোপাধ্যায় । অজয়ের গেরুয়া বালুচরে জ্যোৎস্নার বৈষ্ণবী দেখানো লিয়াদা, কবি লিয়াকত আলি। শ্রীচৈতন্যের পর বাংলার ব্যান্ডের অন্যতম স্রষ্টা মনিদা , মহীনের ঘোড়াগুলি 'র গৌতমদা, গৌতম চট্টোপাধ্যায়। আরো কতো মন মহাজন । বিচ্ছেদের তালিকাটি খুব

দীর্ঘ ।

যিনি বলেছিলেন, ‘‘আমার জীবনের সবকটি সংক্রান্তি জয়দেব কেন্দুলিতেই কাটবে ।’’

সেই শক্তিদা, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ।

সবাই না, কেউ কেউ কথা দিয়ে শেষ অব্দি কথা রেখে যান । জীবনের শেষকটি সংক্রান্তি মজা ও মচ্ছবে জয়দেব কেন্দুলিতেই কাটিয়ে গেছেন শক্তি দা ।বাংলার কবি সম্রাট শক্তি চট্টোপাধ্যায় ।

আসলে কেন্দুলিতে কবিরাই বাউল, বাউলরাই কবি । এরা সবাই গত পাঁচ দশকের, সেই গ্যাস আর পেট্রমেক্স হেচাকের আলো থেকে বর্তমান বৈদ্যুতিন আলো জ্বেলে জেগে থাকা কেন্দুলি মেলার প্রিয় সঙ্গী, সখা, দাদা, আউল বাউল ।

অনেকদিন পর সেবার জঙ্গলমহল কবিতা উৎসব ফেরত লালপাহাড়ির অরুণ দা । কবি অরুণকুমার চক্রবর্তী হঠাৎ করে চলে গেলেন । যাবার আগে আসানসোলের কবিদের সঙ্গে দলবেঁধে খালি গায়ে মহানন্দে বুদ্বুদস্নান করে গেলেন উস্রি ঝর্নায় । এখানে পাথর কাটছে জলের ছুড়ি । অনন্ত পাথরের বুকে এখানেই জল দিয়ে অকপটে জীবনের কথা লিখলেন ওরুণদা ।

এদের প্রত্যেকের স্মৃতিতে মাত্র এক মিনিটের শোকস্মরণ যথেষ্ট নয়, এদের জন্য প্রায়দিন সময়ের স্মৃতিবেদীতে অশ্রু উৎসর্গ করে আমার দুচোখ ।

আসলে, প্রিয়বন্ধু চারণ কবি ও লোকগায়ক নারায়ণ কর্মকারকে ছুঁয়ে একটি মৃত্যুর কথা লিখতে গিয়ে এতগুলি প্রিয় মানুষের মৃত্যু কথা লিখতে হলো পরপর । ওরা সবাই একে একে এলো ।কেননা ওরাই তো আমার অস্তিত্বের অতিথি ।

মানুষের নিজস্ব সম্পদ ও ঐশ্বর্যের মূলসত্বা, তার মন । এই মন দিয়ে আরো একবার পরপর স্পর্শ করতে হলো ওদের ।এইসব মানুষেরা অনেকদিন থাকবে আমাদের স্মৃতিতে। থাকবে বলেই প্রতিটি স্মৃতি সময়ের অঙ্ক ছুঁয়ে রজতজয়ন্তী থেকে সুবর্ণ জয়ন্তীতে পৌঁছাবে। যাত্রাপথে মনের ভিতর শুইয়ে রেখে দেবে এক একটি অভিসারের অন্তরগুপ্তি কথা ।অসংখ্য শোকের চিঠি সময়কে ছুঁয়ে চুপচাপ পড়ে থাকবে স্মৃতির টেবিলে । আমাদের দিন কাটবে সেইসব স্মৃতিকে নড়াচড়া করে । সময়ের বুক জলে দাঁড়িয়ে আত্মার আত্মীয়দের জন্য এ যেন এক স্মৃতিতর্পণ। এতগুলি মৃত্যুমুখকে মনে করিয়ে দিল চারণ কবি বন্ধু নারান ।

চলে যাবার তালিকায় আগাম নাম লিখিয়ে হঠাৎ চলে গেল প্রিয়বন্ধু পদকর্তা ও চারণ কবি নারান, নারায়ণ কর্মকার ।কে যে কখন কিভাবে চলে যাবে সেকথা কেউই জানেনা ।

বহুদিনের রেওয়াজ অভ্যাসে আউলবাউল একটা যাপন ছিল আমাদের । ছিল মেলামচ্ছব, সাধুগুরু বাউল বৈষ্ণবের আখড়া আঁটান, আস্তানা । আমাদের জন্য সবখানে প্রবেশ দরজা ছিল হাট খোলা ।যেখানে ছিল না সেখানে আমরা টুঁশ মেরে ঢুকেছি, বাওয়ালি করে ঢুকেছি ।

সময়ের অরণ্যে ঢুকে অনেকদিন অনেক গুহামুখ দেখেছি আমরা । জ্যোৎস্নার চিরকুট হাতে রাত্রিকে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি আমাদের ঘরে, ঘুন ধরা ভাঙা চৌকাঠে ।আমাদের মন জুড়ে তখন দিনরাত কবিতার মেঘ বৃষ্টি । মনমাতনে মেতে বৃষ্টি অন্বেষণপুষ্ট চাতক ওড়াউড়ি । তখন আমরা কখনো জলপথে, কখনো স্থলপথে, জীবন চিহ্নিত মূর্তবিমূর্ততার নিবিড় সহাবস্থানে । উড়েছি আকাশ ডানায়,, ঘুরেছি ঘুঘু চক্করে, তান্ত্রিক তন্ময়তায় থেকেছি বুঁদ হয়ে ।

আমাদের মতো এমন উড়নচন্ডী স্বভাব পেয়েছে কী এই প্রজন্মের তরুণ কবিরা ?

সবখানে সবার সঙ্গে আমরা, জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে জেগে থাকে যে শ্মশান ও গোরস্থান ।

সেখানে কথা বলেছি বারবার । শ্যামকুন্ডে ডুব মেরে প্রেমের পলি বালি হাতে রাধাকুন্ডে ভেসে উঠেছি আমরা । এইভাবে স্বশাসিত সৃষ্টির ক্ষেত্রে একজীবনে যাকিছু যতটুকু দরকার সবটুক ফুটে যাবার আগে হ্যাঁ, সবকিছু প্রেমসে লুটে নিয়েছি আমরা ।

ভবের বাজারে সযত্নে সংসার পেতেও অন্তরে থেকেছি অনন্ত সন্ন্যাসী । যখন তখন বাইরে দূরে ঘুরে বেড়াবার বা' বাতাস লাগিয়েছি খালি গায়ে । নেশাতুর শ্মশান

ভৈরব কিংবা গোঁসাই এর হাত থেকে চিমটে কেড়ে নিয়ে জ্বলন্ত আঙার তুলেছি তার অগ্নিকুন্ড থেকে ।
এক জীবনে কীই না করেছি আমরা । মন্ত্রে থেকেছি মৌনতা নিয়ে । অগ্নি জলের চুড়ান্ত গন্ডুষে প্রতিটি রাত্রির হাতে একসাথে তুলে দিয়েছি অমৃত ও বিষ। নেশাচুর চাঁদকে পড়ে থাকতে দেখেছি শুঁড়ি খানার ভেজা চৌকাঠে । ভালোবাসার যৌথ সন্ধিতে সারারাত করেছি জ্যোৎস্না ভাগাভাগি । কতো দিন ধূ ধূ রোদের ভিতরে সাজিয়ে রেখেছি ভালোবাসার দীর্ঘ ছায়াপথ । যে কোন শ্মশানে জ্বলন্ত চিতা কিংবা ইলেকট্রিক চুল্লিতে ছোঁ মেরে ছুঁয়ে ছিনিয়ে এনেছি স্তব্ধ জীবনের না পোড়া রূপকথা । এত কিছু করেও দিব্যি ফিরে এসেছি আমরা জীবনের কাছে , কবিতার কাছে একান্ত প্রিয় ঘরে ও সংসারে ।
নাচঘরে পায়ে ঘুঙুর বাঁধা গানের কাছে । আমরা তো জানি ,স্বল্পায়ু অতি তুচ্ছ এই জীবনে এইসব কান্ডকারখানার এক গভীর মূল্য আছে ।

সেবার আহেলী পত্রিকার আমন্ত্রণে আমি, নারান , কবি অসীম শীল, নবলোক সম্পাদক রাসবিহারী শীল । একসাথে, এক যাপনের অনুপ্রেরণায় । আমরা সবাই একসাথে হৈ হৈ করে তারাপীঠে ।
আছি তারামার কোলের কাছে এক রিসর্টে । সন্ধ্যাসন্ধী আমরা সবাই মনের টানে ঘুরে এসেছি মহাশ্মশান। শ্মশানে এসে আমরা সবাই তো ফিরে যাই , একদিন আসবো সেদিন আর ফিরে যাবো না ।
মধ্যরাতে নিদ্রাদেবী নিমরাজি। ঘুম আসতে চাইছে না দুচোখে ।আমাদের মন টানছে মহাশ্মশান ।
যাবতীয় উসখুসুনি থামিয়ে হঠাৎ নারান বল্ল ,
- চলো নীলু এক চক্কর ঘুরেই আসি ।
অসীম রাজি ।রাসবিহারী বিছানায় ।
তিনজনে একমনে চলে এলাম মহাশ্মশানে ।
এ এক মহাযাত্রা ।ভরা চাঁদের জ্যোৎস্নাশাসন নেই আস্ত আকাশের বুকে । কালো বোরখায় ঢাকা রাত্রির হেঁয়ালি মুখ ।এ যেন , অন্য এক রাত আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে । চারদিকে ধুনি জ্বলছে । চলছে তন্ত্রচক্র । মৃদুমন্ত্রে ভেঙে যাচ্ছে শ্মশান মৌনতা ।

নানান মাপের আত্মতন্ময় সাধুসন্ন্যাসী ও মনস্কামনাপূরন প্রার্থী মানুষের নানান কুড়োমাতুনিতে , মদমচ্ছবে , তন্ত্রচক্রে জেগে আছে মহাশ্মশান । জানি, নানান কুমন্ত্র সুমন্ত্র জানে এখানের সাধুরা । কেউ কেউ বলে, ক্ষমতার বলে সাধক সাধুরা নাকি দিনকে রাত , রাতকে দিন করে দিতে পারে । মনোবাঞ্ছার তান্ত্রিকহোমে হাপিত্যেশ করা মানুষকে মিলিয়ে দিতে পারে সবকিছু ।
এ যেন যাদু কাঠি । ধুসশ্লা, তাই আবার হয় নাকি ? যা হবার তা আপসে হয় । হবার না হলে হাজার হাজার বাহারি হোমজগ্নিতে কিছুই হয়না ।
তন্ত্রচক্রে হঠাৎ আগুন জলে আচমন করার ইচ্ছা হলো আমার । কিন্তু আগুন জল পাই কোথায় ? কী ভাবে হবে সেই আত্মখোলা আচমন ?
নারায়ণ বল্ল, - আরে ভাবছো কি নীলু ।
ইটো তারাপীঠ মহাশ্মশান বটেক ।ইখানে মাটি খুঁড়লেই জল মিলে ।চলো মাটি খুঁড়ি ।
দেখলাম ,শ্মশানে দারুন সদ্ভাব আছে কবি অসীম শীলের ।শ্মশান শিকড়ে জেগে আছে তার গভীর আত্মীয়তা । তার এক আত্মীয় এখানকার সাধু ।সংসার সন্ন্যাসী ।

যাবার জন্য জেনেছি , তলে তলে তৈরি ছিল নারায়ণ । মৃত্যুরোগ তার হৃদয় পিঞ্জরেবেশ কিছুদিন ছিল পোষা পাখি । তবু তার হৃদিপদ্মে সবসময় খেলা করতো কতো কতো গান , কবিতা । জীবন অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ কতো সুনিপুণ গদ্য ।সবকিছু নিয়ে শেষদিন পর্যন্ত তার জীবন গ্যালারি ছিল ভরপুর । শেষদিকে সময়মাচায় শুকনো একটা লাউজালির মতো পড়েছিল সে ।

নারান একদিন আমাকে বলেছিল - থেকে থেকে ওপারের ডাক শুনতে পাচ্ছি নীলু ।
মৃত্যু কাছে এসে যাবার নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছে জীবনের দরজায় । আর দেরি নাই । আর দেরি নাই । এবার কোনোদিন হয়ত শুনবে নারান আর নাই । চলে গেছে নারান।
হলোও তাই , আমাদের কাছে এক জীবন গ্যালারিতে অনেক স্মৃতি গচ্ছিত রেখে চলে গেল নারায়ন কর্মকার ।

প্রিয় নারায়ণ কর্মকারকে মনে রেখে কিছু কথা

সুনীল করণ

কারও স্মৃতিচারণ করা, তা-ও যদি তিনি কোনও ব্যক্তির জীবনে বিশেষ স্থানাধিকারী হন, সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তাঁকে নিয়ে কিছু লেখা ভীষণ বেদনাদায়ক।

হ্যাঁ, বলছি প্রয়াত নারায়ণ কর্মকারের কথা। কবিতা পাঠ, গান গাইতে বা অন্য কোন কাজে কলকাতায় এলে তিনি সাধারণত দক্ষিণ কলকাতায় অবস্থিত আমার বসত বাড়িতে এসে উঠতেন। তিনি এই বাড়িটিকে প্রায়ই তাঁর দ্বিতীয় বসত বাড়ি বলতেন। বাড়িতে এসে স্নান সেরে, গৃহকর্ত্রীকে বলতেন, ''বৌদি, জননী আমার দেশলাইটা দিন। পুজোপাঠ সেরে আহার করব।''

এখন আর তাঁর মধুর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে না। গত ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ তিনি না ফেরার দেশে চলে গেছেন।

সাধারনতঃ বাড়িতে এসে বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে বা পরদিন সকাল সকাল উঠে আমার হারমোনিয়াম নিয়ে বসতেন। উদাত্ত কণ্ঠে গান গাইতেন। আমার গানের খাতা চেয়ে নিয়ে বলতেন, ''সুনীলদা, আপনার গানে গানে সুর করব।'' আমার লেখা অনেক গানেই তিনি সুর করেছেন।

যাইহোক, নারায়ণদা যে শুধু সুরকার ছিলেন তাই নয়, কবি, গীতিকার, শিল্পী, ঔপন্যাসিক। কলকাতা দূরদর্শনে যেমন তাঁর গান শুনেছি আমরা, তেমনি শুনেছি বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও।

হুগলি জেলা কবিতা অকাদেমি, সোনালী রোদ পত্রিকার সঙ্গেও তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

এক সময় সোনালী রোদ পত্রিকার কলকাতা অফিসের ঠিকানা ছিল ১৫/৩ বিবেকানন্দ পার্ক, কলকাতা ৬৩-র আমাদের এই বাড়িটি। সেই সময় সোনালী রোদ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে প্রশান্ত মানিক, তপন মুখোপাধ্যায়, শাকিলা বেগম, সুনীল চক্রবর্তী, বুলবুলি ব্যানার্জী, রঞ্জনা রায়, নারায়ণ কর্মকার প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক এসেছেন এখানে।

একবার সোনালী রোদ সুহৃদ পরিবারের উদ্যোগে প্রেমের কবিতা সংকলন 'প্রিয়ংবদা' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মণ্ডলীতে নারায়ণ কর্মকারও ছিলেন। সংকলনটি প্রকাশ করেন তাপসী আচার্য, চারুপত্র প্রকাশনীর কর্নধার।

সেই প্রেমের কবিতা সংকলনে নারায়াণদার তিনটি প্রেমের কবিতা ছিল। কবিতা তিনটি হল ' বুকের খাঁচায় প্রেম', ' প্রেম অধরা' এবং ' ভালোবাসা'। 'ভালোবাসা' কবিতাটির প্রথম চার লাইন উদ্ধৃত করলাম।

''তোমার কথা মনে এলে
আকাশ ভাঙি মধ্যরাতে
মনে এলে তোমার কথা
দাঁড়িয়ে পড়ি চলতি পথে।''...

তিনি অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'শব্দবাঁশি', 'সৃষ্টির আড়ালে'। লিখেছেন কয়লাখনি নিয়ে উপন্যাস 'আঁধার ঘরের কালো মানুষ' এবং 'গহীন গাঁড়ার গোপন গন্ধ'। আদিবাসী 'পাহাড়ী পাড়ার পারো', গ্রামীণ লোকায়ত 'বিলাসী'।

কামাখ্যা মন্দির নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন 'কামাখ্যা মন্দির কথা এবং' তাছাড়া ' ব্রহ্মচারী কালীসাধক বসন্তবাবা' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এখানে বলাবাহুল্য যে নারায়ণ কর্মকার গদ্য, পদ্য অনেককিছুই লিখেছেন এবং তাঁর লেখায় রাঢ় বাংলার জনজীবনের অন্তরঙ্গ ছবি ফুটে উঠেছে। তাঁর অনেক লেখনীতে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের যাপনচিত্রটিও

তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অতি সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

তাঁর গদ্য-পদ্যের কিছু কথা তুলে ধরলাম। এখন তাঁর গীতিকাব্য সম্বন্ধে কিছু না বললেই নয়। একাধারে ঔপন্যাসিক আবার গীতিকার, সুরকার, শিল্পী, কবি ইত্যাদি নানান গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি।

সম্ভবতঃ ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হবে। তিনি তাঁর প্রায় নয়শত পাতার বিশাল গীতিকাব্য 'হৃদয়পুরের গান' তুলে দিলেন আমার হাতে। আমি মুগ্ধ। বইটি তৎক্ষণাৎ নেড়েচেড়ে দেখলাম, পড়লাম, অবাক হলাম। দেশগান, বাউল, লোকগান, পল্লিগান, ঝুমুর, আধুনিক ছাড়াও ভিন্ন স্বাদের গান হৃদয় স্পর্শ করে।

কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর প্রয়াত জননী যামিনী কর্মকারের কথা উল্লেখ করেন। জননীর উৎসাহ, সহযোগিতা তাঁকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করেছিল। তাঁর গানে তবলায় বিশেষভাবে সহযোহিতা করতেন তাঁর ভাই মধুসূদন কর্মকার।

বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রাম ভাড্ডি, জাহিদপুরে থেকে কীভাবে তিনি নিজেকে তুলে ধরেছেন ইত্যাদি নানান কথা।

বিশেষ করে আর একজনের কথা নারায়ণ কর্মকার আমাকে প্রায়ই বলতেন। তাঁর কথা না বললেই নয়। তিনি হলেন বিশিষ্ট কবি সমরেশ মণ্ডল। কবির সঙ্গে তখনও আমার পরিচয় ঘটেনি। নারাণদা বলতেন, কবি সমরেশ মণ্ডল একজন আদ্যোপান্ত ভালো মানুষ। তাঁকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, গড়ে তুলেছেন তাঁকে। তাঁর কথার যথার্থতা পরে বুঝেছি আমি, জেনেছি প্রিয় কবি ফটিক চৌধুরীর কাছ থেকেও। নারানদা বলতেন কবি অসীম শীলের কথাও।

কয়লা খনির চতুর্থ শ্রেণির কর্মী হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের শুরু। গ্রাম থেকে অফিস প্রায় ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ সাইকেলে করে যাওয়া-আসা, তার সঙ্গে গান শেখা, গান লেখা, এক সংগ্রামী জীবন ছিল তাঁর। পরে তিনি গানের শিক্ষকতাও করেছেন। কবি সমরেশ মণ্ডলের বিশেষ উদ্যোগে গ্রামীণ কবিসভা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলার কবিসভা, সাহিত্য আড্ডা এমনকি আকাশবাণী, কলকাতা দূরদর্শনেও পৌঁছে যান গানের ডালি নিয়ে। এভাবেই তিনি অসংখ্য অনুরাগীর মন জয় করেছেন।

নারায়ণ কর্মকার অসংখ্য গান লিখেছেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেছেন আবার তাঁর সিডি, ক্যাসেটও প্রকাশিত হয়েছে অনেক। সেই সিডি, ক্যাসেটের কিছু কথা না বললেই নয়। প্রথম ক্যাসেট প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। নাম 'জন্মেছি এ গাঁয়ে'। তারপর 'ঘুরে মলাম সই', ' সুন্দরের আর এক নাম সঙ্গতি', ' পিরিতে পেত্নী সোনা', ' ভোলাবাবারে', 'প্রেমে নাইরে কারফিউ', 'অন্যস্বাদের গান', 'কি যাদু দেখাই যাদুকর', 'মন চলরে তারাপীঠে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নারায়ণ কর্মকারের জীবনযাত্রা খুবই সাধারণ হলেও তিনি ছিলেন সকলের মনের মানুষ। তাঁর চলনে, বলনে, লেখার মধ্যে, গানের মধ্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তিনি লিখতে পেরেছেন -

''আমরা খাদে খাটা লুক
আমাদের পাথর পারা বুক
জীবন ভরই খেটে মরি
পাই নারে ভাই সুখ।''

কিংবা

''মাটির ভেতর জলের কলস
আসমানে যার প্রাণ
মাটি কেটে কোরছে পিরিত
দেখরে কেমন টান।''

সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, নানান প্রতিকূলতার মধ্যে কেটেছে তাঁর দৈনন্দিন জীবন। তবুও তাঁর মুখের হাসিটি ছিল অম্লান। তাই তো নারায়ণ সারা বাংলা এমনকি

বাংলার বাইরেও বিভিন্ন জায়গা বিচরণ করে, জীবনের বাঁকে বাঁকে নানান দৃশ্য অবলোকন করে তিনি লিপিবদ্ধ করতে পেরেছেন –

"আমার চাল চুলো নেই
নেই রে আপন পর
আকাশ মাটির মধ্যে খানটায়
সবখানেই আমার ঘর
বিশ্বভুবন আমার স্বজন
তাদের দুঃখ সুখে বুক ভরে যায়।"

ভাড্ডি বীরভূম জেলার একটি সাধারণ গ্রাম। তবুও গ্রামের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে নারায়ণের নাম। শুধু গ্রামের মধ্যেই কেন? পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এমনকি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। গ্রামের মেঠো পথ ধরে তিনি যেমন হেঁটেছেন স্বচ্ছন্দ্যে, তেমনি শহরের রাজপথেও তিনি বিচরণ করেছেন গানের ডালি নিয়ে। বাউল জীবনযাত্রার সঙ্গে, বাউল গানের ভালোলাগার সঙ্গে তাঁর জীবনযাত্রা জড়িয়েছিল ওতপ্রোত ভাবে।

তাই তো তিনি পেয়েছেন অসংখ্য মানুষের সম্মান, নানান অনুষ্ঠানে গিয়ে পেয়েছেন প্রাণভরা ভালোবাসা আর সম্মান। তাঁকে বিশেষ সম্মান জানিয়েছিলেন বীরভূমের সিউড়ি কলেজের অধ্যক্ষ, বিখ্যাত আঞ্চলিক ভাষ্য বিশেষজ্ঞ, সুপণ্ডিত ড. সুধীর করণ।

আমার লেখা অনেক গানে তিনি যেমন সুর দিয়েছেন, তেমনি বাড়িতে এসে আমার হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে শুনিয়েছেন অসংখ্য গান। আমার লেখা এই গানটি ছিল তাঁর খুব প্রিয় –

" ওরে পাগল পাগল
সবাই পাগল
কম বেশি তা সব জন
পাগল ছাড়া আছে ক'জনা
কেউ বা পাগল
আসল পাগল
কেউ বা সেজে থাকে পাগল
তারাই আবার ঘুরে ঘুরে
বানায় রে পাগলখানা
পাগল ছাড়া আছে ক'জনা . . . ।"

এই গানটি এবং আরও বেশকিছু গান তিনি আমাদের ' টাট্টুঘোড়া' পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠানেও গেয়েছেন। তিনি সিডি, ক্যাসেটও করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিকে তাঁর শারীরিক অসুস্থতা ও নানান প্রতিকূলতার জন্য তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। প্রায়ই তিনি কবি সমরেশ মণ্ডল, কবি অসীম শীল এর কথা বলতেন। নারায়ণ কর্মকারের জন্ম ১৯৫২ সালে, বীরভূমের খয়রাশোল থানার ভাড্ডি গ্রামে। চলে গেলেন ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬। তিনি যেখানেই থাকুন, শান্তিতে থাকুন। তাঁর পরিবারের প্রতি রইল আন্তরিক সমবেদনা।

ভরে রইলো বুকের তলা . . .

অতনু বর্মন

কারো কাছেই বলা হয়নি সেসব, যা এক অপরিচিত ভারতজ্যোতি রায় চৌধুরীর নিভৃত কথন। ভারত জ্যোতি রায়চৌধুরীর পরিচয় সত্তরের অশান্ত নকশালবাড়ি রাজনীতির একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে, বাংলা বিহার সীমান্ত কমিটির নেতৃস্থানীয় কমরেড হিসেবে সর্বজনবিদিত। তার রাজনৈতিক মতাদর্শ তথা বিপ্লবী কাজকর্ম নিয়ে আমি কিছু লিখতে বসিনি। আমি লিখব সেই মানুষটিকে নিয়ে যে আমার শৈশবের হিরো, আমার কল্পনার নগুয়েন ভ্যান ত্রয়। আমার মামা প্রদ্যোত কুমার রায়চৌধুরীর প্রথম পুত্র ভারতজ্যোতি আমার দাদা। কয়েকটি পর্বে লেখাটিকে ভাগ করে নিতে চাইছি ক্রম অনুযায়ী।

কি সুর বাজে আমার প্রাণে

আমার স্মৃতির অলিন্দে প্রথম যে ছবিটি আজও ঝলক দিয়ে ওঠে সেটা ৬৯ সালের রামপুরহাটের একটি বিকেল বেলা। আমি তখন ৫ বছরের শিশু। তখনও স্কুলে ভর্তি হইনি, রামপুরহাট ছিল আমার মেসোমশাই প্রভাত কুসুম ঘোষের বাড়ি। অপুত্রক মাসি ও মেসোমশাইয়ের অপার স্নেহ আশৈশব প্রথমে ভারতজ্যোতি এবং পরে আমার ওপর বর্ষিত হয়েছে। সেই অপার্থিব বিকেলে ঝড়ের মতো বাইরে থেকে ঘরে এসে ঢুকলো সে, খাটের তলা থেকে অনেকগুলো লাঠি সমেত লাল ঝান্ডা বের করে নিয়ে ঝড়ের মতোই আবার মিলিয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে দেখেছিলাম ঝান্ডার রং পুরোপুরি লাল, কোন রকম কাস্তে হাতুড়ি অথবা কাস্তে ধানের শীষ আঁকা ছিল না। সেই আমার প্রথম দেখার স্মৃতি। তারপর সে চলে গেল আত্মগোপন পর্বে। দীর্ঘ ৫ বছর তার কোন খবর ছিল না। আদৌ সে আছে কিনা সেই প্রশ্নে চিন্তিত ছিল আমাদের গোটা পরিবার। ১৯৭৫ সালে দুর্গাপুর থেকে গ্রেপ্তার হলো ভারতজ্যোতি, আত্মগোপন পর্বে তখন তার নাম অশোক রায় চৌধুরী। আজও বহু জন তাকে অশোক নামেই চেনেন।

দ্বিতীয়বার যখন দেখেছিলাম তখন আমি ১১ বছরের বালক। স্থান সিউড়ি জেল। জানলার লোহার জালের ওপাশে রোগা ছিপছিপে এক যুবক, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, ভগৎ সিঙের মত পাকানো গোঁফ। আরো দুই বছর পর ১৯৭৭ সালে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির সময় জেল থেকে সে বেরিয়ে আসে। আমার বয়স তখন ১৩। পরবর্তীকালে সময় পেরিয়েছে দ্রুত, বিয়ে হয়েছে মল্লিকা দির সঙ্গে। তার আসল নাম পূরবী মল্লিক। সেও ছিল নকশাল বিপ্লবী। ভারতজ্যোতি যখন আত্মগোপন পর্বে সেই সময় ওই রামপুরহাটেই প্রথম তাকে দেখেছিলাম। তখন তার ছদ্মনাম মল্লিকা। আমি আজীবন তাকে মল্লিকা দি নামেই ডেকেছিলাম। ভারত জ্যোতি দুর্গাপুরে থাকতে লাগল, পেশা হিসেবে বেছে নিল কন্ট্রাক্টরি। জন্মালো তাদের একমাত্র সন্তান ব্রতী। ডাকনাম ক্যাপ্টেন। মহাশ্বেতা দেবীর হাজার চুরাশির মা যারা পড়েছেন তারা ব্রতী নামটি জানেন। এরপর শুরু হবে কয়েকটি পর্ব।

দুর্গাপুর পর্ব

মাঝখানে পেরিয়ে গিয়েছে দীর্ঘ সময়। ভারতজ্যোতিদা এখন দুর্গাপুরে ঠিকেদারী করে। কন্ট্রাক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সে তখন। আমাকে একদিন ফোন করে বলল এক ঘন্টার খুব ভালো একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। আমি সিউড়ির

মুক্তমন সংস্থাকে নিয়ে গেলাম তাদের আবোল তাবোল পরিবেশনের জন্য। সেই সন্ধ্যায় প্রথম অনুষ্ঠানটি ছিল কবিতার। উর্দু সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি ও তৎকালীন আইজি বেঙ্গল ক্রাইম আয়ান রসিদ খানের একটি কবিতার বই তখন প্রকাশ পেয়েছে। বইটির নাম আবলুশি ভাবনা। কবিতাগুলি অনুবাদ করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সেই সন্ধ্যায় সুনীল ও শক্তি এসেছিলেন রসিদের সঙ্গে। ১৯৭৫ সালে এই আয়ান রশিদ খান ছিলেন বীরভূমের পুলিশ সুপার। জেলখানাতেই ভারতজ্যোতির সঙ্গে রসিদের গভীর সখ্য গড়ে উঠেছিল। সেই অপূর্ব সন্ধ্যাটির বছর দুয়েক পরে দ্বিতীয়বার দুর্গাপুরে ভারতজ্যোতির সঙ্গলাভ। আমার তখন স্ত্রী আছেন উপরন্তু সন্তানের পিতা আমি, এইরকম এক সময়ে দুর্গাপুর উৎসবে অনুষ্ঠান করার ডাক পেলাম। আমি এবং আমার স্ত্রী তনুশ্রী নির্দিষ্ট দিনে দুর্গাপুরে পৌঁছিয়ে দেখি ভারতজ্যোতিদা এই উৎসবের হর্তাকর্তা। আমাদের অনুষ্ঠানের পরে গানের অনুষ্ঠান ছিল অভিজিৎ বোসের। সেই প্রথম অভিজিতের গান শোনা আমার। এত ভালো লাগলো যে অনুষ্ঠানের পরে ভারতজ্যোতিদা কে বললাম ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। দাদা বলল রাত্রে ও আমার বাড়িতেই ডিনার করবে সুতরাং সেখানেই আলাপ হবে। সেই রাত্রি কেটে গেল গান বাজনা আর সুরা সহযোগে।

দিব্যি চলছিল সবকিছু, কিন্তু আকাশ তো সবসময় মেঘ মুক্ত থাকে না, বছরখানেক পরে হঠাৎ খবর পেলাম মল্লিকা দি আর নেই। ফোন করেছিলাম, ফোনটা কেটে দিল সে। ভাবলাম ব্যস্ত আছে হয়ত, কিছুক্ষণ পর আমার মোবাইল স্ক্রিনে একটা মেসেজ এলো। ভারতজ্যোতি লিখছে বিনয় মজুমদারের কবিতার লাইন...

হে আলেখ্য, অপচয় চিরকাল পৃথিবীতে আছে, এই যে অমেয় জল... মেঘে মেঘে তনুভূত জল...এর কতটুকু আর ফসলের দেহে আসে বলো ?

আশা করি মানুষটাকে বুঝতে এই উদাহরণটাই যথেষ্ট। কথায় কথায় কবিতার পংক্তি উদ্ধৃত করা ছিল তার মজ্জাগত। পরবর্তীকালে আরো নিবিড় ও গভীর হবে আমাদের সংসর্গ এবং তখন সাহিত্যের সঙ্গে তার সংযোগ যে কতখানি সেটা উপলব্ধি করব। সে প্রসঙ্গ আসতে এখনো দেরি আছে, আপাতত অন্য পর্বে যাওয়া যাক।

পর্ব চকচাঁদনী

সময়টা ৯০ এর শুরু, আমি তখন বিবাহিত যদিও কোন স্থায়ী উপার্জন নেই এইরকম একটা সময়ে একদিন ভারতজ্যোতিদা এলো আমাদের আমোদপুরের বাড়িতে। ও তখন নতুন একটা ভেঞ্চার নিয়ে টগবগ করে ফুটছে। ময়ূরাক্ষীর কোলে চকচাঁদনী বলে একটা জায়গায় প্রায় ৯০ একর জমি ইজারা নিয়ে ও একটা এগ্রিকালচার ফার্ম করার কথা ভাবছে। প্রতিষ্ঠানটার নাম ভেবেছে কৃষিজ। মূলত সিড কর্পোরেশন থেকে আলুর বীজ কিনে চাষ করে আবার বীজ হিসেবেই সিট কর্পোরেশনকে বিক্রি করে দেওয়ার ব্যবসা। বলল চাইলে তুই আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারিস। আমি তো হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম। তারপরের দুই বছর আমার জীবনের এক সমৃদ্ধ অধ্যায়।

ভারতজ্যোতিদা, আমি আর ওর শ্যালক জ্যোতিপ্রিয় এই তিনজনের এক স্মরণীয় জীবনযাপন। সারাদিন চাষবাসের দেখাশোনা করা, ফসলের মরশুমে রাত জেগে খড়ের ঝুপড়িতে ফসল পাহারা দেওয়া আর রোজ সন্ধ্যেবেলা তিনজনের গান বাজনা কবিতা আর গল্পের আসর। মাঝে মাঝে জুটে যেত আদিত্য, আদিত্য মুখোপাধ্যায়। সে তখন ওই নারায়ণঘাটিতে বাসা নিয়ে থাকে। অদূরেই কোটাসুরে দিদিভাই পত্রিকার দপ্তর। সেখানেও মাঝে মাঝে চলে যাই। ওই বিশাল জমিটার মালিক ছিল স্বপন মৈত্র বলে এক ভদ্রলোক। বুক পর্যন্ত

সাদা দাড়ি, ঘাড় পর্যন্ত সাদা চুল, প্রথম দেখাতে সন্ন্যাসী বলে ভুল হবে এমন একজন মানুষ। তার ভাই রতন মৈত্রও প্রায় একই রকম দেখতে। তিনি সংসার ত্যাগী। কৃষিজ ফার্মের শেষ প্রান্তে ময়ূরাক্ষীর কোলে তার আশ্রম। পাথরের কালী মূর্তি । সেখানেও দিনের অনেকটা সময় কাটাতাম আমি। আদিত্য আসতো ওর সদ্য লেখা কবিতা নিয়ে, পড়ে শোনাতো আমাকে। আমিও শোনাতাম আমার লেখালেখি। দুজনে মুখোমুখি বসে আমরা যেসব কবিতা পরস্পরকে শোনাতাম সেগুলো নিয়েই একটা বই করে ফেললাম, বইটার নামও 'দুজনে মুখোমুখি'। ছেপেছিল কাঞ্চন সরকার। এই কাঞ্চনের উস্কানিতেই আমরা একটা ফিচার ধর্মী কাগজ বের করলাম চকচাঁদনী থেকে। কাগজটার প্রথমে নাম দিয়েছিলাম 'ভারতজ্যোতি'। কিন্তু দাদা এই নাম থাকলে লিখবে না বলল বলেই দুটো সংখ্যার পর নাম বদলে রাখা হলো 'ইঙ্গিত'। তখন থেকে সঞ্জয় ছদ্মনামে অয়নাংশ বলে একটা ধারাবাহিক রচনা লিখতে শুরু করলো ভারতজ্যোতি। ওই পত্রিকার অশোক রুদ্র সংখ্যা এতটাই চাহিদা তৈরি করেছিল যে পত্রিকাটা দ্বিতীয়বার ছাপতে হয়েছিল। লেখা বাহুল্য সেই সংখ্যার সমস্ত লেখা একা হাতে লিখেছিল ভারতজ্যোতি। বছর দুয়েক ছিল আমাদের সেই কৃষিজর নানা রঙের দিনগুলি। খুব স্বাভাবিক নিয়মেই সেটা রইল না। ১৯৯২ সালে কৃষিজ তুলে দিয়ে আমরা ফিরে এলাম আবার যে যার জায়গায়। যেদিন চকচাঁদনী থেকে ফিরে আসছিলাম , যেতে যেতে জ্যোতি পিছন ফিরে তাকিয়ে ছিল ফার্মের দিকে, ভারতজ্যোতিদা বলল পিছনে তাকাবে না কেউ, যা ছেড়ে এসেছি তা একেবারেই ছেড়ে এসেছি। শুধু সামনে তাকাও। আমি জীবনকে চিনেছি, বাঁচাকে জেনেছি ওই মানুষটির হাত ধরে।

পর্ব যাদবপুর

চক চাঁদনী পর্ব শেষ হবার পর সে চলে গিয়েছিল মালদা। সেখানে ইন্ডিয়ান অয়েলের গ্যাস ফিলিং এর কন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করেছিল কয়েক বছর। ব্রতী ওরফে ক্যাপ্টেন ততদিনে প্রতিষ্ঠিত, তার বিয়ে। বিয়েটা প্রথাগতভাবেই হবে অর্থাৎ ছাদনাতলায়, কিন্তু ভারতজ্যোতি তো এইসব মানেনা, সুতরাং সে জানিয়ে দিল যে, আমি ওই বিয়েতে থাকছি না তবে আমি কলকাতায় একটা রিসেপশন দেবো আমার বন্ধুবান্ধবদের জন্য, সেখানে তোমরা আসতেও পারো না এলেও কোন অসুবিধা নেই। কথাটা লিখলাম মানুষটাকে চিনতে সুবিধা হবে বলে।

যদিও ক্যাপ্টেন এবং তার নববধূ এসেছিল সেই দিন। কলকাতা লেক ক্লাবে সেই অনুষ্ঠানে আমিও ছিলাম।

এরপর ভারতজ্যোতি যাদবপুরে একটা ঘর ভাড়া করে থাকে এবং লিখতে শুরু করে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ "৪৭ থেকে ৭০ এবং তার আগে পরে" নামের একটি অসাধারণ গ্রন্থ। এই পর্বে আমি বারবার যাদবপুরে তার বাড়িতে গিয়েছি, রাত্রে থেকেছি, তার নির্দেশ অনুযায়ী সংগ্রহ করেছি নানান তথ্য, সেই সময়ের ময়ূরাক্ষী, দিদিভাই, চন্দ্রভাগা পত্রিকার কাটিং পৌঁছে দিয়েছি তার কাছে। ধূসরমাটি পত্রিকার সংখ্যা গুলো অরুণ চৌধুরী দেবো দেবো করে কিছুতেই দিলেন না যখন তখন সাহায্য করেছে কাঞ্চন সরকার। তার সংগ্রহ থেকে পত্রিকা গুলোর ফটোকপি পৌঁছে দিয়ে এসেছি যাদবপুরে। এই ভাবেই এক সময় ছাপা হয়েছে বীরভূমের সশস্ত্র সংগ্রামের অনন্য দলিল। ছেপেছে পুনশ্চ প্রকাশন সংস্থা। যাদবপুরের বাসা ছেড়ে দিয়ে ভারতজ্যোতি আবার এসেছে বীরভূমে। নতুন ঠিকানা বোধপুরের বাগান।

বোধপুরের বাগান

কলকাতা পর্ব চুকিয়ে সে এলো বীরভূমের সাঁইথিয়ার কাছে বোধপুরের বাগানে। তখন বাগানটার মালিকানা ছিল বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের। আমাদের বিশুদা। অশান্ত সত্তরের আর এক দুরন্ত নায়ক। এখন অবশ্য বাগানটা বিক্রি হয়ে গেছে। এই বাগানটা দেখাশোনার দায়িত্ব

ছিল দাদার। সেই বিশাল বাগানে বিরাট একটা অংশ ছিল আম গাছের, কিছুটা লিচু গাছের, বাকি বিস্তীর্ণ জমিতে চাষ হতো ধান আলু গমের। আমি তখন সাঁইথিয়া হাই স্কুলের শিক্ষকতা করি। সময় পেলে মাঝে মাঝেই চলে যেতাম সেখানে। ভারতজ্যোতি কখনো কখনো ডেকে পাঠাতো আমাদের সকলকে। আমার দুই বোন পাপড়ি ও পাপিয়া, দুই ভগ্নিপতি জ্যোতি ও চন্দন এবং তাদের ছেলে মেয়েরা। সে এক অনিন্দ্য সুন্দর পিকনিক হতো ওখানে। ভারতজ্যোতি নিজে রান্না করত খাসির মাংস। কুক হিসেবেও সে ছিল অনন্য। সেই মাংসের স্বাদ এখনো আমার জিভে লেগে আছে। অমন রান্না আমার বাবা ছাড়া আর কাউকে রাঁধতে দেখিনি। ভারতজ্যোতির খুব স্নেহের ছিলেন কাকলি দাস। কাকলি এবং শান্তনু এই দম্পতিও বোধপুরের বাগানে গিয়েছেন, সারারাত গান বাজনায় কেটে গিয়েছে। আহা কি সোনার দিন ছিল সেইসব। কিন্তু চিরকাল তো এক ভাবে যায় না, তাই বোধপুর পর্বও একদিন ফুরিয়ে গেল।

শেষ পর্ব

বোধপুরের বাগান ছেড়ে সে কেন চলে এসেছিল সেই কথা আমি লিখতে চাইছি না। মোটামুটি এটা জেনে রাখুন যে, আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল বলেই ওই পর্বের ইতি ঘটিয়ে ভারতজ্যোতি চলে গিয়েছিল বোলপুরের কাছে একটা বৃদ্ধাশ্রমে। সেখানেও তার শর্ত ছিল আমার ঘরে কোন বুড়োদের প্রবেশাধিকার থাকবে না কারন আমি কোনদিন বুড়ো হবো না। দ্বিতীয়ত রাত্রি দশটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে এরকম নিষেধাজ্ঞা আমার ক্ষেত্রে চলবে না, আমি রাত্রি তিনটেতেও বাড়ি আসতে পারি। তৃতীয়ত আমার কাছে আমার বন্ধুবান্ধবরা যখন খুশি আসবে গান বাজনা করবে খাওয়া-দাওয়া করবে তাতে কোনরকম আপত্তি করা চলবে না। এই সমস্ত শর্ত মেনে নিয়েই তাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখা হয়েছিল। এই পর্বে আমার সঙ্গে আর কোনো রকম যোগাযোগ ছিল না তার। যদিও আমি শৈলেন মিশ্রর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তার খবর নিতাম। আমি জানতাম যে আমি ছাড়াও তার আর একজন ভীষণ প্রিয় মানুষ আছে এই বীরভূমে যার নাম জুলফিকার জিন্না। সে আমারও প্রাণের বন্ধু এবং ভাই। তার কাছেও খবর নিতাম মাঝে মাঝে। জানতে চাইতাম কেমন আছে আমার শৈশবের হিরো। জানিনা কোন অভিমানে আমার সেই নগুয়েন ভ্যান ত্রয় নিজেকে সরিয়ে নিলেন আমার থেকে। তারপর একসময় খবর পেলাম বোলপুর বৃদ্ধবাস থেকে ভারতজ্যোতি চলে গিয়েছিলেন হুগলির একটা বৃদ্ধাবাসে। এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। ভারতজ্যোতি রায় চৌধুরীর মৃত্যু হতে পারে না। অন্তত আমি যতদিন বেঁচে আছি।

ফোটেনা কোনো স্বর

অসীম শীল

যেভাবে থেমে যায় বিকেল মেঘের খেলায়
সেভাবেও যদি থামতে!
রোদের আশায় বুক বেঁধে কাটতো প্রহর
বোবাকান্না বুকে ,ফোটেনা কোনো স্বর

যাওয়া নিশ্চিত সবার তবু থেকে যেতে চায়
অক্ষরে অক্ষরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়
ঝাঁকড়া চুলে খেলতো বাউল হাওয়া
কণ্ঠজুড়ে সুরের চলন -বলন

শরীর তোমার নেইকো আজ কাছে
জেগে আছো সবার হৃদয় মাঝে
তেল- শলতেয় আগুন ,সৃষ্টি প্রজ্বলন।

প্রতিবাদের স্মৃতি, ইতিহাসের প্রশ্ন-

ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী ও শৈলেন মিশ্র

জুলফিকার জিন্না

বীরভূমের প্রতিবাদী-আন্দোলনের পরিচিত দুই ব্যক্তিত্ব ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী ও শৈলেন মিশ্র মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। নভোলোকের নতুন অতিথিরা একদিকে একান্ত শ্রমণে আসর জমিয়েছেন এতক্ষণ, অন্যদিকে এক স্নিগ্ধ স্মৃতির অনঘ স্পর্শময়তা নিয়ে যারা এপারে থেকে গেছেন তাদেরই একজন হয়ে আমি খুবই সামান্য এক পরত লেখার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই বলে রাখি, এই দুই ব্যক্তির রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে আমার দুস্তর পার্থক্য। তাঁদের সাথে আমি যতটুকু সময় কাটিয়েছি তাতে তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিসম্বাদ বেশি হয়েছে। তবু এরই মাঝে বেশ কিছু সময় নিবিড় সাহচর্যে কেটেছে বলেই অনেকটা কাছে থেকে ব্যক্তিমানুষগুলিকে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি। আমি নিশ্চিতভাবেই এটা জানি, বীরভূমের বুকে প্রতিবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা হলে যাদের নাম উঠে আসবে তাদের মধ্যে- অবশ্যই ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী ও শৈলেন মিশ্রের নাম থাকবেই। প্রথমে ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী সম্পর্কে কিছু কথা বলা যাক। যতদূর জানি, তাঁর পরিবারেই ছিল রাজনৈতিক সংস্কৃতির নিরবচ্ছিন্ন চর্চা। পরাধীন ভারতে ১৯৩৪ সালে তাঁর পিতা প্রদ্যোত রায়চৌধুরী বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হয়ে আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দি হয়েছিলেন। অন্যদিকে স্বাধীনভারতে কৃষকদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রদ্যোত রায়চৌধুরীর পুত্র ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরীও জেলে গিয়েছিলেন ১৯৭৩ সালে। প্রজন্মের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের সাথে কারাগারের বন্দিত্বের ভবিতব্যই যেন উত্তরাধিকার হিসেবে সঞ্চারিত হয়েছিল।

বীরভূমের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে ভারতজ্যোতিদা একটা বই লিখেছিলেন 'সাতচল্লিশ থেকে সত্তর এবং আগে পরে'। স্মৃতিকথামূলক এই গ্রন্থটি পাঠ করলে ভারতজ্যোতিদার স্মৃতির প্রাখর্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। সাল তারিখ দিনক্ষণ ধরে ধরে বীরভূমের কৃষক আন্দোলন ও কৃষক সংগঠনের বিবর্তনকে যেভাবে তিনি গ্রাফিক্যালি উল্লেখ করেছেন তা ভবিষ্যতের গবেষকদের কাজকে অনেক সহজ করে দেবে। আমি ভারতজ্যোতিদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি এই বইটি কেন লিখেছেন? এটা কি নিছক একাডেমিক পারপাস সার্ভ করার জন্য? না কি আপনি এখনো সত্তরের আন্দোলনের মৌতাত আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান? 'আমার প্রশ্নের উত্তরে ভারতজ্যোতিদা বলেছিলেন, ''মানুষের রাজনৈতিক অভিযাত্রা এক বিরামহীন দৌড়, সেই দৌড় চলতেই থাকে। আমি এই বইটা লিখলাম দৌড়ের মাইলস্টোনগুলিকে চেনানোর জন্য''। ভারতজ্যোতিদার এই বক্তব্য নিয়েই তীব্র বিতর্ক হয়েছিল আমাদের মধ্যে। আমি বলেছিলাম মাইলস্টোনগুলিকে আপনি আপনার মতো করে সাজিয়েছেন। সারা পৃথিবীতে কমিউনিস্ট চেতনার বিকাশে যে সমস্ত মাইলস্টোনগুলি আছে সেগুলি আপনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। আমার বক্তব্য সেদিন ভারতজ্যোতিদা মানেন নি। তিনি বলেছিলেন, '' যাঁরা সত্তরের দশকের উত্তাল সময়ে নকশালবাড়ির আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই আন্দোলন ও মতাদর্শকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাদের বক্তব্যকেও বোঝার চেষ্টা করছি।'' সত্যিই তিনি সেটা করছিলেন। কমরেড কিষাণ চ্যাটার্জি নকশালপন্থী রাজনীতিকে তীব্রভাবে নাকচ ক'রে যখন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মাইনোরিটিদের রাজনীতিকে সামনে আনছিলেন তখন ভারতজ্যোতিদা অত্যন্ত ধৈর্য

সহকারে কিষাণদার অনর্গল বলে যাওয়া বক্তব্যকে ক্যাসেটবন্দী করেছিলেন। টানা তিন দিন ধরে চলতে থাকা এই বক্তব্য আমিও শুনেছিলাম।

ভারতজ্যোতিদা সমাজের রাজনৈতিক ইতিহাসের তথ্য সংগ্রাহক। তিনি তথ্যের উপাদান দিয়ে কাহিনিকে রাঙিয়ে তুলেছিলেন। তিনি ইতিহাস লিখেছেন আখ্যানের ঘরানায়। তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন আখ্যান যেন সময়ের দলিল দ্বারা সমর্থিত হয়। তাই তাঁর বই হাতে নিলে সময়টাকে চেনা যায় ছবির মতো।

শৈলেনদার লেখা 'জ্যোৎস্নারাতের সত্তর দশক' বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন ভারতজ্যোতিদা।

দু'জনের সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়। একসময় যে কোন সামাজিক আন্দোলনে এই দুইজনকে একসাথে বোলপুরের রাস্তার মোড়ে দেখা যেতো, পরের দিকে শারীরিক কারণে হয়তো ভারতজ্যোতিদা আসতে পারতেন না, আর শৈলেনদাও সরাসরি রাজনৈতিক দল ছেড়ে এপিডিআর এর দিকে ঝুঁকেছিলেন বলে দু'জনের যোগাযোগটা ক্ষীণ হয়ে আসছিল। পারিবারিক রাজনৈতিক ঐতিহ্যে শৈলেনদার অবস্থান ছিল ভারতজ্যোতিদার ঠিক বিপরীত। শৈলেনদার দাদু স্বামী অচ্যুতানন্দ ছিলেন বারাণসীর বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং আর্যসমাজের পণ্ডিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগ দিয়েছিলেন। এই অচ্যুতানন্দ মিশ্রকে নিয়েও শৈলেনদা একটি বই লিখেছেন। শৈলেন মিশ্রের বাবা বিদ্যাসাগর মিশ্র ছিলেন ডাঙালি কালীতলার পুজারি।

বোলপুর চৌমাথা থেকে যে রাস্তাটা রেলপুল পেরিয়ে নিচুপট্টির দিকে চলে গেছে, সেই রাস্তা থেকে অনন্তলাল হরিগতি-দে-র কাপড়ের দোকান ছাড়িয়ে, ডানদিকের গলিপথ চলে গেছে ডাঙালি কালীতলা। এখানে এখনো পুজো হয়। এইরকম একটি বাড়িতে জন্মে শৈলেনদা কিভাবে নকশালপন্থী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন সেটা ভেবে তিনি নিজেই অবাক হয়েছিলেন। আমি অবশ্য অবাক হই নি, কারণ সত্তরের দশকের যুবকরা একটা রাজনৈতিক থ্রিলে অ্যাডিক্টেড হয়ে রোমাঞ্চ আস্বাদন করেছিলেন। সঠিক রাজনৈতিক চেতনা অর্জনের সংগ্রামের ইতিহাস থাক বা না থাক অনেকেই স্রোতের জলে সন্তরণের আমোদে মত্ত ছিলেন। এর খেসারতও দিতে হয়েছে। অজস্র অমূল্য প্রাণ অকাতরে ঝরে গেছে। রাজনৈতিক অভিমুখ বিজ্ঞানসম্মত না থাকায় শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্তি কাটিয়ে সঠিক পথের সন্ধান অনেকেই করতে পারেন নি। সেটা আরো ভালভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, যখন সত্তরোত্তর পর্বে নকশালপন্থী সংগঠনগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং সেই অ্যাডিকশনের ঘোর কেটে যায়, তখন প্রায় সকলেই দিশেহারা হয়ে পড়ে। অনেকেই বিপ্লবের খোয়াব ভেঙে ছোটখাটো সামাজিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনের বৃত্তে নিজেদের সীমায়িত রাখে।

আমরা দেখেছি; যাঁরা একসময় লেনিনের উদ্ধৃতি দিয়ে বুর্জোয়া পার্লামেন্টকে 'শুয়োরের খোঁয়ার' বলে ভোট বয়কট করতেন, পরবর্তী সময়ে তাঁদের কেউ কেউ সেই পার্লামেন্টারি রাজনীতিতেই প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। যারা এখনো কমিউনিস্ট বিপ্লবের স্বপ্ন লালন করেন, তারা এই প্রশ্নগুলো তুলতেই পারেন। এই কারণেই আমার এই লেখা নিছক আবেগঘন স্মৃতিচারণ নয়। কারণ আজও ছাত্র-যুবকদের একাংশের উপর ভারতজ্যোতিদা ও শৈলেনদাদের মতো প্রতিবাদী মানুষের প্রভাব যথেষ্ট। শৈলেনদার মরদেহের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ছাত্রযুবকদের চোখে সেই আবেগের অশ্রু দেখেছি। এই প্রভাব যদি রাজনৈতিক হয়ে থাকে, তবে উত্তরপ্রজন্মকে কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই হবে।

একটি কৃষক সংগ্রামের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে 'কৃষি বিপ্লব'-এর মাধ্যমে 'নয়াগণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ' গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত CPI(ML) আদৌ কি একটি কমিউনিস্ট পার্টি বা শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী ছিল?' সবচেয়ে বড় প্রশ্ন; কৃষক অভ্যুত্থান থেকে কি সত্যিই একটি কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হতে পারে? বিপ্লবী রাজনীতির নামে যৌবনের অপচয় রোধ করা আজকের দিনে একটি রাজনৈতিক কর্তব্য।

রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও এই দুই ব্যক্তির সঙ্গে আমার এক আন্তরিক সামাজিক সম্পর্ক

ছিল। বয়সের বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। আমি যে কোনো প্রশ্ন নির্দ্বিধায় তাঁদের করতে পারতাম। আমার স্ত্রী পূর্ণিমার অসুস্থতার সময় একদিন ভারতজ্যোতিদা একটি বই হাতে করে এলেন। বললেন, "এই বইটা পূর্ণিমাকে পড়তে দিও।" বইটি ছিল পল কালানিথির "When Breath Becomes Air"। ক্যানসারের সঙ্গে কীভাবে লড়াই করতে হয়, সেই বিষয়ে লেখকের আত্মজীবনীমূলক অভিজ্ঞতা সেখানে আছে। সেদিন ক্যানসার নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল। আমরা কথা বলেছিলাম;এই সমাজে ক্যানসার যতটা না রোগ, তার চেয়ে অনেক বেশি এক কর্পোরেট ব্যবসা।

এইসব আলোচনার সূত্র ধরেই আমি ক্রমশ লক্ষ্য করছিলাম;পুরোনো নকশালপন্থীদের অনেকেই ধীরে ধীরে NGO-ধর্মী সামাজিক কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। শৈলেনদাকে আমি দেখেছি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে সরব হতে। সত্তরের বিপ্লবীদের পরবর্তী কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালে বোঝা যায়;এক ধরনের বিপ্লবী রাজনীতি কীভাবে শেষ পর্যন্ত সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এসে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী ও শৈলেন মিশ্র;এই দুই মানুষের জীবন সেই ইতিহাসেরই এক মানবিক দলিল। তাঁরা তাঁদের সময়ের সন্তান ছিলেন; প্রতিবাদের পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং সেই পথের নানা বাঁক ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিজেদের গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর যে সাহস তাঁরা দেখিয়েছেন, তা অস্বীকার করা যায় না।

ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী ও শৈলেন মিশ্র;এই দুই মানুষ এক অস্থির রাজনৈতিক যুগের প্রতীক। তাঁদের জীবনে যেমন ছিল প্রতিবাদের সাহস, তেমনই ছিল সেই যুগের বিভ্রান্তি, আকাঙ্ক্ষা এবং অপূর্ণতার ছাপ। তাই তাঁদের স্মরণ করা মানে শুধু ব্যক্তিগত স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানানো নয়; বরং সেই সময়ের রাজনীতি, তার সীমাবদ্ধতা এবং তার শিক্ষা;সবকিছুকেই নতুন করে বিচার করা। কারণ ইতিহাসের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা আবেগে নয়, আত্মসমালোচনায়। হয়তো ভবিষ্যতের প্রজন্ম সেই আত্মসমালোচনার ভেতর দিয়েই বুঝতে পারবে;কোথায় ছিল প্রতিবাদের সত্য, আর কোথায় ছিল বিপ্লবের স্বপ্নের ভেতর লুকিয়ে থাকা বিভ্রান্তির বীজ।

আজন্ম জুড়ে থাকে প্রেম

তাপসকুমার চট্টরাজ

আগুন আর হাতুড়ির সাথে
আজন্ম জুড়ে থাকে প্রেম
অস্বীকার না করেও
কলম ও সুর
মেল বন্ধন গড়ে তোলে যখন
তখনই জন্ম হয় শিল্পীর

খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আগুন
জাগিয়ে তোলে
অন্তরের ঘুমিয়ে থাকা
সত্ত্বা
জীবন টেনে নিয়ে যায়
কালোহিরের গুহায়
একদিকে মেলা, মচ্ছব
গুণী সহযোগ
অন্যদিকে সংগ্রাম
অবহেলা,হতচ্ছেদ্দা

টলাতে পারেনি কবি ,বাউলের
স্বভাবী মন
বেতার ,দূরদর্শন, মঞ্চে অবলীলায়
কণ্ঠে ওঠে হৃদয়পুরের গান
সুরের মোলায়েম ছোঁয়া
অদ্ভুত আবেশে জয় করে হৃদয়।

ভারতজ্যোতি ও শৈলেন স্মৃতিকথা

আলোক মুখার্জী

ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী

জন্ম ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬, মৃত্যু ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

মুর্শিদাবাদ জেলার মালিহাটি গ্রামে যখন জন্মগ্রহণ করেন ভারতজ্যোতি তার আন্দামান ফেরৎ পিতা প্রদ্যোত রায়চৌধুরী তখন জীবিকা সন্ধানে ব্যস্ত ।তারই মধ্যে দেশভাগ ও ব্রিটিশদের ক্ষমতা হস্তান্তর।শেওড়াফুলিতে কৈশোর ও তারুণ্য । বাবার কমিউনিস্ট পার্টির যোগাযোগের ফলে তরুণ অবস্থায় কয়েকজন পার্টি নেতার সান্নিধ্য। ১৯৬৫-র খাদ্য আন্দোলনের সময় সিপিআইএম এর কর্মী ও বিপি এস এফ (বাম)এর সদস্য। পার্টির কর্মকাণ্ডে আস্থার অভাব। পারিবারিক কারণে রামপুরহাট কলেজে ভর্তি। ১৯৬৭ তে নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের সমর্থনে পৃথক ছাত্র সংগঠন গঠনে শরিক ও নেতৃত্বের ভূমিকা।নানা জটিলতা অতিক্রম করে ১৯৭০এর মাঝামাঝি সিপিআই(এম এল)এ যোগদান। সংগ্রামের সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দান।১৯৭১এর জুলাই এর শেষে পশ্চিমবঙ্গ বিহার সীমান্ত আঞ্চলিক কমিটির পূর্ণ সদস্যপদ। ১৯৭১এর ডিসেম্বরে পার্টির তৎকালীন লাইনের বিরোধিতাতে আরসির সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে একমত।দুর্গাপুর থেকে গ্রেফতার।জেল থেকে বেরিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলে নিজেকে যুক্ত না করলেও নকশালবাড়ির রাজনীতির প্রতি আস্থা অটুট ছিল । দুর্গাপুরে ঠিকাদারি করার মধ্যে বিজ্ঞানমঞ্চ ও কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ভারত পাকিস্তান জনগণের মৈত্রী কমিটির সদস্য হিসাবে পাকিস্তান যান, 'ওয়াঘার ওপারে' নামে বই লেখেন। বীরভূমের কমিউনিস্ট আন্দোলন ১৯৪৭ এর আগে পরে সম্বন্ধে জনপ্রিয় বই লেখেন । শেষ জীবনে বীরভূমে ফিরে আসেন।শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতালে জীবনাবসান ঘটে।জীবনভর সমাজ বদলের স্বপ্ন বুনে চলা কমরেড ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী লাল সেলাম!

শৈলেন মিশ্র

জন্ম ৬ অক্টোবর ১৯৫১, মৃত্যু ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

বোলপুরের বিখ্যাত ডাঙালিকালি মন্দিরের পুরোহিত পরিবারে জন্মানো শৈলেন মিশ্রের শৈশব ও কৈশোর ছিল নিস্তরঙ্গ । তবে ছিল স্বাভাবিক নেতৃত্বের গুণ । তারুণ্যে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ছেলেদের জুটিয়ে জনসেবার উদ্দেশ্যে ক্লাব গঠন করে । নকশালবাড়ি আন্দোলনের বিষয়ে আগ্রহী শৈলেন ১৯৬৯ এর শেষে সিপিআই (এমএল) এর সঙ্গে যুক্ত হয় । ১৯৭১ এর মার্চে প্রথম গ্রেপ্তার হয়। জামিন পেলেও আদালতমুখো না হয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করে, একের পর এক সশস্ত্র অভিযানে শৈলেন মিশ্রের ভূমিকার জন্য সে শাসকদের লক্ষ্য হয়ে যায়। পার্টি পার্শ্ববর্তী গ্রাম এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানেও কয়েকবার জনগণের সাহায্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচে । বীরভূমকে ততদিনে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।ডিসেম্বর নাগাদ বিপর্যয় নেমে আসলে শৈলেন বীরভূম ছাড়তে বাধ্য হয়। চরম দুর্দশা ও অনিশ্চয়তায় নানা স্থানে আশ্রয় না পেয়ে ১৯৭২ এর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আবার জেলে যায়। ১৯৭৪ এ জেল থেকে বেরিয়ে গোপনে তৎকালীন ঐক্য কমিটি, সিপিআই (এমএল) এর সদস্য হিসাবে কাজ শুরু করে জরুরী অবস্থায় আবার গ্রেপ্তার হয় । কয়েক মাস পরে ছাড়া পায় ।১৯৭৭সালে বোলপুর কলেজে ভর্তি হয় ও ছাত্র ঐক্য কমিটি গঠন করে। একই সময়ে পার্টি কাজে আত্মনিয়োগ করে। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বোলপুর পৌরসভার উপপৌরপতি ছিল । ওকালতি

পাশ করে বোলপুর কোর্টে ওকালতি করেছে । তবে শৈলেনের আসল পরিচয় জনগণের যে কোনও আন্দোলনে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দান। বোলপুরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে প্রতিরোধে শৈলেন কোনও বাধা বিপত্তির পরোয়া না করে ঝাঁপিয়ে পড়তো। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার। নিজের রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি বই লিখেছে। তার জীবনযাত্রার মতই সরল সে সব বই-এর ভাষা। সমাম বদলের সংগ্রামের সৈনিক গণ-আন্দোলনের নেতা কমরেড শৈলেন মিশ্র লাল সেলাম!!

এক বর্ণময় বৃক্ষের নাম শৈলেন মিশ্র

রামানুজ মুখোপাধ্যায়

নাম অচ্যুতানন্দ মিশ্র। বাড়ি বিহারের ছাপড়া জেলার বনিয়াপুর থানার বেদৌলি গ্রামে। তিনি সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় আধ্যাত্মিক বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য বেনারসে গিয়েছিলেন। সেখানেই পরিচিত হয়েছিলেন আর্য সমাজের প্রাণপুরুষ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে। স্বামী দয়ানন্দের স্নেহ-সান্নিধ্যে আর্য সমাজের পণ্ডিত হয়েছিলেন অচ্যুতানন্দ মিশ্র। উনিশ শতকের শেষ দিকে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের সুখ্যাত বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের বাসগৃহে অগ্নিহোত্রী যজ্ঞের পুরোহিত হিসেবে এসেছিলেন শহর কলকাতায়। শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ভালোবাসায় তিনি কলকাতায় থেকে গেলেন। ইতিমধ্যে গড়ে উঠলো কলিকাতা আর্য সমাজ। অচ্যুতানন্দ তার প্রথম পণ্ডিত নিযুক্ত হলেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শঙ্করনারায়ণ পণ্ডিত প্রমুখকে বললেন, তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম মন্দিরের জন্য একজন সুপণ্ডিত উপাসকের সন্ধানে আছেন। সেইসূত্রেই ১৮৯১-এর ২১ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে এলেন অচ্যুতানন্দ মিশ্র। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বিশ শতকের গোড়ায় শান্তিনিকেতন আশ্রম ছেড়ে তিনি কীভাবে বোলপুরের ডাঙালি কালীতলায় এলেন, সেও এক অকথিত ইতিহাস। প্রপিতামহ অচ্যুতানন্দ, পিতামহ বাগীশ, পিতা বিদ্যাসাগর, পুত্র শৈলেন। এই পারিবারিক ঐতিহ্য থেকেই উঠে এসেছিলেন বীরভূম জেলার নকশাল আন্দোলনের জনপ্রিয় ও সুপরিচিত নেতৃত্ব শৈলেন মিশ্র।

শৈশবে শৈলেন মিশ্রের পড়াশুনো শুরু হয়েছিল বোলপুর বাসন্তীতলা উদ্বাস্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখানেই ভুলক্রমে তাঁর জন্ম তারিখটি লেখা হয়েছিল ৫ এপ্রিল ১৯৫২। কিন্তু শৈলেন জন্মেছিলেন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৬ অক্টোবর, শারদীয় দুর্গাপুজোর মহাষষ্ঠীর বোধন-সন্ধ্যায়। ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়টির এখন আর অস্তিত্ব নেই। সেখান থেকে শৈলেন এসেছিলেন বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। ১৯ ৭০ খ্রিস্টাব্দে পাশ করেছিলেন উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায়। ভরতি হয়েছিলেন বোলপুর কলেজে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে ছেদ পড়েছিল কলেজের পড়াশোনায়। ১৯৭০-এর জানুয়ারি থেকে সিপিআই এমএল) রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই দলের সঙ্গেই পথ

চলেছিলেন তিনি। ছিলেন জেলার দায়িত্বেও। সাতের দশকের অশান্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর জীবনের ছয়-সাতটি বছর কেটে গিয়েছিল নানা অস্থিরতায়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে বোলপুর কলেজেই ফিরে এসেছিলেন ছাত্র হিসেবে। সেখানেও ছাত্র সংসদ পরিচালনায় শৈলেন মিশ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের মার্চে তিনি বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বোলপুর পৌরসভার নির্বাচিত উপ পৌরপতি হিসেবে শৈলেন মিশ্রের কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ভাগলপুরে তিলকা মাঝি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আইন অধ্যয়নের জন্য ভরতি হয়েছিলেন। পাস করেছিলেন ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে বোলপুর আদালতে ক্রিমিনাল কেসের উকিল হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন।

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত 'নয়াপ্রজন্ম' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন 'মন্দির-মসজিদ বিতর্ক অনিবার্য কিছু কথা'। সেই লেখাটির সন্ধান এখন আর আমাদের কাছে নেই, লেখকের কাছেও ছিল না। পত্রিকার দপ্তরে হয়তো থাকতে পারে। এ-লেখার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে লেখালেখির কাজে ধারাবাহিকভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন শৈলেন মিশ্র। এই কাজে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিলেন সত্যশ্রী উকিল। মূলত নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকথা পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন শৈলেন। তাঁর বইগুলি - ১. জ্যোৎস্নারাতের সত্তর দশক, ২০১৪, কলকাতা গাঙচিল।

২. নকশালবাড়ি মানুষের ভূমিকা, ২০১৭, কলকাতা গাঙচিল।

৩. শান্তিনিকেতনে অচ্যুতানন্দ, ২০১৮, শান্তিনিকেতন বইওয়ালা বুক ক্যাফে।

৪. সত্তরের ডায়েরি, ২০২০, বোলপুর বীরুৎজাতীয় সাহিত্য সম্মেলনী।

৫. উত্তাল সত্তর, ২০২৫, শান্তিনিকেতন বইওয়ালা বুক ক্যাফে।

এই বইগুলি পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলনের অকথিত নানা ইতিহাসকে তুলে ধরেছে। সমাদৃত হয়েছে সারস্বত পাঠকের দরবারে। বইগুলির ভূমিকা লিখেছেন সন্তোষ রাণা, অসীম চট্টোপাধ্যায়, ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী, সত্যশ্রী উকিল প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নানা ধরনের স্মৃতিকথা লেখার কাজেই ব্যস্ত ছিলেন তিনি। লিখেছেন নিজের শৈশবস্মৃতি। অশোক রুদ্র পান্নালাল দাশগুপ্ত শ্যামলী খাস্তগীর - এমন অনেক বিরল ব্যতিক্রমী মানুষদের সঙ্গে তাঁর সময়-যাপনের স্মৃতি-আলেখ্য লিখে রেখেছেন নিজের ডায়ারিতে। এই লেখাগুলি প্রকাশের আলো দেখেনি। করোনা মহামারির সময়ে বোলপুরের অশীতিপর প্রবীণ মানুষদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন তিনি। সেইসব সাক্ষাৎকারের মূল অভিমুখ ছিল বোলপুর শহরের গড়ে ওঠার গল্পের দিকে। সে-লেখাও অগ্রন্থিত। ২০২৫- এ জয়দেব অঞ্চল সংস্কৃতি পরিষদের সুহৃদরা ভক্তি ভবনে বাৎসরিক সাহিত্য উৎসবে তাঁকে বিশিষ্ট লেখক হিসেবে মারহুম স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত করেছিলেন। আগামী দিনে আমরা তাঁর সুসম্পাদিত রচনাসংগ্রহ প্রকাশে সচেষ্ট হব। অগ্রসর হব প্রয়াণপ্রশস্তি ও স্মরণালেখ প্রকাশের কাজে।

বৃক্ষের মতো এমন সৎ, নির্ভীক, আত্মনিবেদিত মানুষ এই অন্ধকারময় সময়ে বিরল, দুর্লভ। কয়েক দিনের অসুস্থতার পরে ২০২৬-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাবেলায় তাঁর অনুরাগীদের বিস্মিত করে দিয়ে বিদায় নিলেন শৈলেন মিশ্র। শেষবেলায় তাঁকে একইসঙ্গে আমাদের প্রাণভরা আলিঙ্গন আর আভূমি প্রণাম জানাই।

শৈলেন - ভারতজ্যোতি- নারায়ণ স্মরণে

রণজিৎ মুখোপাধ্যায়

শৈলেন মিশ্র (১৯৫১ - ২০২৬)

সি.পি.আই.(এম.এল.) এর একজন দায়িত্বশীল নেতৃত্ব, গণ আন্দোলনের যথার্থ সংগঠক, আইনজীবী, প্রাক্তন উপপৌরপিতা শৈলেন মিশ্র ছিলেন নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ভরসাস্থল। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী শৈলেন মিশ্র, একজন উঁচু দরের লেখকও। তাঁর প্রথম বই 'জ্যোৎস্নারাতের সত্তর দশক'। প্রকাশ নভেম্বর ২০১৪, প্রকাশক অনিমা বিশ্বাস, গাঙচিল প্রকাশনী। উপস্থাপনা করেছেন সন্তোষ রানা, কথামুখ লিখেছেন ভারতজ্যোতি রায় চৌধুরী। সত্তরের সেই দিনগুলিতে বীরভূম জেলায় সংগঠিত নকশাল আন্দোলনের ইতিহাস। রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা বীর যোদ্ধাদের উপর নির্মম অত্যাচার, তাদের অনেকেই শহীদ হয়েছেন - অনেকে কারান্তরালে গেছেন - কারাগারেও বন্দীদের উপর অত্যাচার - এসব কিছু নিয়ে তাঁর এই গ্রন্থ। শৈলেন মিশ্র এই বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় হৃদয়স্পর্শ করা অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন

'' সত্তর দশকে যত মৃত্যু হয়েছে - সে সব মৃত্যুতো আসলে দেশকে মুক্ত করার, দেশের মানুষকে স্বাধীন, সক্ষম করে তোলার স্বপ্নের মৃত্যু। এসব জীবন ফিরে আসবে না, কিন্তু তাদের মৃত্যু নিয়ে সেই যুবক যুবতীরা ভারতবর্ষের মুক্তির আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। সে আলো নিভতে পারে না, সন্ধিক্ষণের অপেক্ষায় থাকে, দেশকে জাতিকে পুনরায় হাজার সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত করার জন্য। সেই আশা নিয়ে আমাদের কাজ করে যেতে হয়।''

শৈলেনের দ্বিতীয় বই ''নকশাল আন্দোলন - মানুষের ভূমিকা''। এটিও গাঙচিল প্রকাশনীর অনিমা বিশ্বাস কর্তৃক ২০১৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে প্রকাশিত। সম্পাদনা করেছেন শুভাশিস মুখোপাধ্যায়। পার্টিকর্মী, সমর্থক, সহায়ক, প্রচারক ছাড়াও অন্যান্য মানুষদের নিয়ে বৃহত্তর গণ আন্দোলনের ঘটনাগুলি তুলে ধরেছেন। খুবই সম্মান ও মর্যাদার সাথে তুলে ধরেছেন মায়েদের কথা। প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অনেক নেতৃত্বের সাথে তাঁর রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে আর এক জননেতা, যাঁর মধ্যে সংকীর্ণতা ছিল না - তিনি ভক্তিভূষণ মণ্ডল। শুধু ভক্তিভূষণ মণ্ডলই নন - তাদের অগ্রগামী কৃষক সংগঠনের ভূমিকার কথা লিখেছেন। এছাড়া অরুণ চৌধুরী, ব্রজ মুখার্জী, ডাঃ শরদীশ রায়, কৃষ্ণপদ সিংহ রায়, কুমুদ সেনগুপ্ত, শান্তি সরকার, দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত ঘোষ, এনায়েত করিম প্রমুখের কথাও লিখেছেন। অর্থনীতিবিদ অশোক রুদ্র, অধ্যাপক শ্যামল সরকার, অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা অপরাজিতা মুখার্জী, অধ্যাপক সন্তাষ বসু। স্বাধীনতা সংগ্রামী - প্রধানশিক্ষক কিরীটিভূষণ দাস, নয়াপ্রজন্মের সম্পাদক কাঞ্চন সরকার, অনীক পত্রিকা, পল্লিশ্রী পত্রিকা, ময়ূরাক্ষী পত্রিকা এবং অরুণ মুখোপাধ্যায় (আনন্দবাজার) দের কথা লিখেছেন। লিখেছেন বাউল বিশ্বনাথ দাস, রূপরেখা স্টুডিও'র গোরাবাবু এবং অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষের কথা।

শৈলেন মিশ্রের তৃতীয় বই - 'সত্তরের ডায়রী'। এটি প্রকাশ করেছেন বোলপুরের বিরুৎজাতীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অদ্বৈতকৃষ্ণ বসু। ২০২০তে প্রকাশ। কথা মুখ লিখেছেন অসীম চট্টোপাধ্যায়। নকশাল আন্দোলনের আবহে জেলার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র যুব সমাজের অংশ গ্রহণের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তখন কলেজ ইউনিয়নের কর্তৃত্ব থাকতো ছাত্র পরিষদ বা সি.পি. এবং কলেজে, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য রকম ইউনিয়ন গঠিত হয়। যেমন - হেতমপুরে কে.সি.এস.এফ., সিউড়িতে বিদ্যা এস.এফ., বোলপুরে বোলপ-এস.এফ., বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.ইউ.এস.এফ. ইত্যাদিইত্যাদি।

আমার মনে হয় পরবর্তী বিপ্লবী আন্দোলন এবং বামপন্থী আন্দোলনে রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বলিত শৈলেন মিত্রের এই বইগুলি দিশা দেখাবে।

ভারতজ্যোতি রায় চৌধুরী (১৯৪৬ - ২০২৬)

ভারতজ্যোতি রায় চৌধুরী সি.পি.আই.(এম.এল.) এর সাংগঠনিক নেতা শুধু নন তিনি তাত্ত্বিক নেতাও। তাঁর পিতা শ্রদ্ধেয় প্রত্যোৎরায় চৌধুরী যাকে ভারতজ্যোতি মালিহাটির সাগর বলেছেন তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আন্দামান ফেরৎ বিপ্লবী। অন্যজন শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুসুম ঘোষ ভারতজ্যোতি যাঁকে ভালাসের খোকা বলেছেন - তিনিও স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আন্দামান ফেরৎ বিপ্লবী। প্রভাতকুসুম ঘোষ - ভারতজ্যোতি রায় চৌধুরীর সম্পর্কে পিসেমশাই বীরভূমের ভালাস গ্রাম থেকে রামপুরহাট কলেজ এবং বীরভূমে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। দীর্ঘদিন কারাগারে থেকেছেন। তাঁর বিখ্যাত বই " সাতচল্লিশ থেকে ৭০ - আগে ও পরে "। প্রকাশ পুনশ্চঃ, কলকাতা। পৃষ্ঠা ৬৪৮, প্রথম সংস্করণ ২০১১ এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৮, মূল্য ৭৫০, তিনটি পর্ব একত্রিত করা হয়েছে। প্রথম পর্বের শিরোনাম ঃ " বদলীদৌড়", দ্বিতীয় পর্বের শিরোনাম " কমিউনিস্ট ইস্তাহারের শতবর্ষ" এবং তৃতীয় পর্বের শিরোনাম - " ৬৭ - ৬৯ ঃ বিদ্রোহ বিকাশ, বিস্তার এবং বিরোধ"।

১৯৪৭ এর ১৪ আগস্ট হুগলির বৈদ্যবাটী থেকে ইতিহাসের সঞ্চালন - তার যেন আপাতঃ শেষ ১৯৭১ এ বোলপুরে।

বিপুল আয়তনের এই গ্রন্থে ভারতজ্যোতি রায় চৌধুরী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তাঁর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন, উদ্বাস্তু সমস্যা, পশ্চিমবঙ্গে ৫০এর দাঙ্গা, চীন সীমান্তে যুদ্ধ, সি.পি.আই. - দু ভাগ, ৬৬'র খাদ্য আন্দোলন, ৬৭ - ৬৯ নকশাল আন্দোলনের সূচনা - সি.পি.আই.(এম.এল.) গঠন, জরুরী অবস্থা এবং পার্টির সেট-ব্যাক।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় ভারতজ্যোতি লিখেছেন " শুরুতে বাসনা ছিল সত্তরের ঝোড়ো হাওয়ার দিনগুলিকে চিত্রায়িত করা নয়, নথিভুক্ত করা। শুরুও হয়েছিল সেই মতোই। বাধ সাধলো কলম। সত্তর কোথা থেকে এল - সে প্রশ্নের উত্তর তার চাই। উত্তর খুঁজতে পিছনে হাঁটা, উত্তর খুঁজতেই প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব শেষ। . . . . তৃতীয় পর্ব তাই শুধুই সত্তরের কথা বলা হয়েছে। " - এরই সূত্র ধরে আর এক জায়গায় লিখেছেন - "ইতিহাস হল পেরিয়ে আসা আন্দোলনের পথ চিত্র, যার মধ্যেই থেকে যায় পরবর্তী যাত্রাপথের খসড়া রেখাচিত্র। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই সত্তর কে দশদিক থেকে দেখা দরকার। কাজটা বেশ কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়।"

আপনজন নারায়ণ কর্মকার, গায়ক, গীতিকার

নারায়ণ কর্মকার বিখ্যাত গীতিকার। তাঁর অতি পরিচিত গানের সংকলন ' হৃদয়পুরের গান'। প্রকাশ করেছেন সুকুমার দে - সহযাত্রী প্রকাশনী। ২০১০ খ্রীঃ। এই বইয়ের ভূমিকায় যাঁরা কলম ধরেছেন তাঁরাও সাহিত্যজগতের সিদ্ধ পুরুষ। সমরেশ মণ্ডল, তারাপদ হাজরা, আদিত্য মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ঘোষাল, রাধামাধব মণ্ডল এবং অসীম শীল। বৃহৎ কলেবরের এই বইয়ে গানের বিভিন্ন বিভাগ আছে। ১) বাউল গান ২) লোকগান ৩) ভক্তিগান ৪) দেশগান ৫) আধুনিক গান ৬) অন্য স্বাদের গান। গানের সংখ্যা ৬৭৫ বা তার কাছাকাছি।

যে কোন অনুষ্ঠানে এসে অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বুঝে তৎক্ষণাৎ গান লিখে ফেলতে পারতেন। তাতে সুর দিয়ে সেই অনুষ্ঠানে স্ব-কণ্ঠে গানটি পরিবেশনও করতেন। সাহিত্য সভায়, কবি সভায়, সাহিত্যের আড্ডায় তিনি অংশ গ্রহণ করতেন এবং বহু মানুষের সাথে তাঁর সংযোগ ছিল। আকাশবাণী, দূরদর্শন, প্রাইভেট চ্যানেলে তাঁর গান প্রচারিত হয়েছে। প্রাণখোলা সহজ মানুষ। তাঁর গানেই তিনি বেঁচে থাকবেন।

শৈলেন মিশ্র : অন্তরঙ্গ স্মৃতি

দেবকুমার দত্ত

শৈলেন মিশ্র, জন্ম ৬ অক্টোবর ১৯৫১, শনিবার ও প্রয়াণ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, শুক্রবার। তাঁর জন্মের দিন ছিল দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী তিথি। জন্মমুহূর্তে বোলপুর শহরের ডাঙ্গালী কালীতলার বাড়ি থেকে শোনা গিয়েছিল উকিলপটির দে-বাড়ির দুর্গাপুজোর ঢাক-ঢোলের আওয়াজ। ওর মাতৃদেবী বিমলা মিশ্র ভাবলেন, এই পূণ্য তিথিতে প্রথম পুত্রসন্তানের জন্ম বেশ শুভদ ও সুখদ। এই বিশ্বাস থেকেই মা পুত্রকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, দুর্গাপুজোর সময় ষষ্ঠী তিথিতে ফলমূলাদি নিয়ে দে-বাড়ির দুর্গাদেবীর পূজার্চনার জন্য প্রতিবছর যথাসময়ে জমা দিয়ে আসতে। শৈলেন মায়ের এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন।এ চিন্তা অসঙ্গত নয় যে দুর্গাদেবী অপেক্ষা মায়ের প্রতি শৈলেনের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ততোধিক ছিল। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্ভবত এই ব্যাপারে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি।

ডাঙ্গালী কালীমাতার মন্দির ও দেবাঙ্গনের দক্ষিণ দিকে মিশ্রদের আদি বসতবাটি।একসময় এই বাড়িতেই থাকতেন অচ্যুতানন্দ স্বামী ও তাঁর পরিবার-পরিজন। বর্তমানে সেখানে শৈলেন ও চাঁদকুমারের পরিবার বসবাস করে। এই বাড়ির প্রায় গা-ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে প্রকাশ ও বিকাশের পরিবার বসবাস করে।মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে ঢিল-ছোড়া দূরত্বে বিদ্যারত্নের জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন মিশ্রের বসতবাড়ি। বর্তমানে সেই বাড়িতে তাঁর পুত্র উত্তমের পরিবার বাস করে। চিরভাস্বর পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ স্বামীর উত্তরসূরিরা ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে বসবাস করলেও তাঁদের মধ্যে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক-বন্ধন সহজ, অভিন্ন ও হার্দিক। 'জ্যাঠতুতো', 'খুড়তুতো' ইত্যাদি শব্দ প্রজন্মগত ক্রম-অবস্থান বোঝাতে ব্যবহৃত হলেও সম্পর্কের নিরিখে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ও সংবেদনশীল।সুখে-দুঃখে-সম্পদে-বিপদে তাঁরা পরস্পরের প্রতি সহমর্মী ও সহযোগী।

মিশ্র পরিবার সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু জানা যাক। বর্তমান বিহার রাজ্যের ছাপরা জেলার বিদৌলী গ্রামের আদি বাসিন্দা এই মিশ্র পরিবার। বিশিষ্ট বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞ শাস্ত্রবিদ আর্যসমাজী অচ্যুতানন্দ স্বামী এই মিশ্র পরিবারের অলোকসামান্য পূর্বপুরুষ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথামতো শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্মমন্দিরের দ্বারোদঘাটন (৭ পৌষ ১২৯৮ সোমবার ২১ ডিসেম্বর ১৮৯১) উপলক্ষে ব্রহ্মোৎসবে প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যায় পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ স্বামী বেদিতে আসন গ্রহণ করেছিলেন। আশ্রমধারী (রবীন্দ্রনাথের কথায় 'আশ্রমদেবতা') তিনি ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন। শান্তিনিকেতনের কর্মসূত্রে তিনি ডাঙ্গালী কালীতলায় বসতি স্থাপন করেন। মিশ্রদের পরম্পরাটা একটু লক্ষ করা যাক - অচ্যুতানন্দের পুত্র বাগীশানন্দ, বাগীশানন্দের পুত্র ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মানন্দের পুত্র বিদ্যাসাগর ও বিদ্যারত্ন। বিদ্যাসাগর মিশ্রের পুত্র শৈলেন। শৈলেনের আগে তিন দিদি (ইন্দিরা, ভারতী ও পূর্ণিমা) এবং পরে দুই ভাই (সূর্যনারায়ণ ও চাঁদকুমার) ও শেষে দুই বোন (চন্দনা ও বেবি) জন্মান। শৈলেন ও স্ত্রী যোগমায়ার দুই কন্যা অনুরাধা ও সোমা, উভয়েই সংসারী।

বার্ধক্যজনিত কারণে শৈলেনের কাকা বিদ্যারত্ন মিশ্র তখন বেশ অসুস্থ। সেই সময়ে দলীয় কাজে শৈলেনের যাওয়ার প্রয়োজন ছিল খয়রাশোল। সকালে স্নান-জলখাবারের পর শৈলেন খয়রাশোল রওনা দেওয়ার ঠিক আগে কাকার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। উদ্দেশ্য অসুস্থ কাকার শরীর এখন কেমন আছে, সে-সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া। সেই সময় কাকা তাঁর ভাইপো শৈলেনকে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, আজকে বাইরে কোথাও যেও না। কোনও কথা না-বাড়িয়ে বা বিকল্প চিন্তা না করে শৈলেন বোলপুরের বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করলেন। কাকার সংকটময় পরিস্থিতি আঁচ করে একটু দূরে সরে এসে শিশুর মতো

কাঁদতে লাগলেন। হয়তো অসুস্থ কাকার চরম পরিণতি অনুমান করে অস্থির হয়ে পড়লেন। বাস্তব ঘটনা হল, সেদিনই দুপুরবেলায় কাকা ইহলোক ছেড়ে অমৃতলোকে পাড়ি দিলেন। কাকা যেমন আসন্ন মরণের চরণধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন, তেমনি শৈলেনের আশঙ্কাও অমূলক ছিল না।

শৈলেনের খুড়তুতো ভাই সঞ্জয়। দুর্ভাগ্যবশত মধ্য-পঞ্চাশে মারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। সুচিকিৎসা ও সুস্থতা তথা নিরাময়ের উদ্দেশ্যে তাঁকে সুদূর চেন্নাইয়ে নিয়ে যাওয়া হল। শৈলেনও সঙ্গে গেলেন। চিকিৎসার সব ব্যবস্থা নিজে থেকে তদবির করলেন। স্থির হল, রোগীকে নিয়ে চেন্নাইয়ে কয়েকজন থাকবেন। অন্যদিকে শৈলেন ঠিক করলেন বোলপুর ফিরে আসা। একাই। সবাই বেশ চিন্তিত হলেন এই ভেবে যে একা শৈলেনদা এতটা পথ ট্রেনে যাবেন। কোনও অসুবিধা বা সমস্যায় পড়লে তখন কী হবে। যা হোক, তাঁরা দাদাকে অত্যন্ত সাবধানে যেতে পরামর্শ দিলেন। এসব কথাবার্তার আগে ভাই সঞ্জয়কে হাসপাতালে ভর্তি করে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল। দেখে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন শৈলেন। তাই ভাইদের ছেড়ে বোলপুর রওনা হওয়ার মুখে শৈলেন বললেন, সঞ্জয় ভাইটিকে তোমরা ঠিকমতো চিকিৎসা করাও। আমি ঠিক আছি। সাবধানে বাড়ি পৌঁছে যাব। আমার কষ্ট-সমস্যা নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না। ভাইটির অবস্থা নিয়ে তোমরা ভাবো - এটুকু বলেই শৈলেন অজানা আশঙ্কায় অঝোরে কেঁদেছিলেন। তাঁকে থামানো মুশকিল হয়ে পড়েছিল। সে এক বেদনাবিধুর ছবি, বেশ করুণ প্রেক্ষাপট! মানুষ কী অসহায়, তবু আশার পর আশা তার মনে ভিড় জমায়! এই বিশ্বের জাগতিক নিয়ম কিছুটা বুঝেও মানুষ অবোধ শিশুর মতো শেষকালে আচরণ করে।

শৈলেনের মাতৃদেবী এক সময় বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় শয্যাগত। তাই স্বাভাবিক ভাবেই পরিবারের সকলের মনে একটা চাপা উৎকণ্ঠা ও ব্যাপক দুশ্চিন্তা। এমন সময়ে তিনি শৈলেনকে কাছে ডেকে তাঁর হাতে একটি নতুন ধুতি দিয়ে বললেন, এই ধুতিটা তুমি রেখে দাও। পরে এটা বিশেষ কাজে লাগবে। এই কথাটুকু যেন তাঁর মায়ের শেষোক্তি! হ্যাঁ, এই ধুতিটিই মায়ের মৃত্যুর পর শৈলেন অশৌচকালীন পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এই কথাচিত্র যে-কোনও অনুভবী মানুষের ভিতর স্মৃতির কামড় তথা বাঁধভাঙা আলোড়ন তুলবে, এ আমার বিশ্বাস।

সুস্বাদু মাংস খাওয়া নিয়ে একটি মজাদার আখ্যানের এবার উল্লেখ করা যাক। একবার বোলপুরের কোনও হোটেল বা রেস্তোরাঁয় শৈলেন মাংস দিয়ে তৈরি খাবার খেয়ে বাড়ি এসেছেন। (জনান্তিকে বলে রাখা ভাল, শৈলেন বেশ খাদ্যরসিক ছিলেন।) মনের আনন্দে তাঁর বাবাকে বললেন, আজ খুব সুস্বাদু মাংস খেয়ে এলাম। সাত্ত্বিক পুরুষ বিদ্যাসাগর মিশ্র ছেলের মুখে এই কথা শুনে চুপ, হ্যাঁ, একদম নিশ্চুপ। ক্ষণেক পর নীরবতা ভেঙে আহত পিতা উল্লসিত পুত্রকে বললেন, মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্যটা তুমি জানো? পশু জিভ দিয়ে চেটে-চেটে জল খায়। না, মানুষ সেভাবে জল পান করে না। পশু তাই মূলত ও প্রধানত মাংসাশী। তুমি 'সুস্বাদু মাংস' খেয়ে খুব খুশি হয়েছ। তাই তোমার পরিচয় কী হওয়া উচিত, তুমি নিজেই বুঝে নাও। বলা বাহুল্য মাত্র, এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে শৈলেন প্রায় নির্বাক হয়ে পড়েছিলেন। এখন একটি ভোজবাড়িতে শৈলেনের যোগদান ও তার পরের রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা। বিবরণটি পড়তে গল্পের মতো মনে হলেও ঘটেছিল তা-ই। ভোজবাড়িতে মধ্যাহ্ন আহার বেশ তৃপ্তিকর হয়েছিল। ধরা যাক, গলদা চিংড়ির একটি পদ শৈলেনের ভীষণ ভালো লেগেছিল। আয়োজনও ছিল পেল্লাই তথা বেশ বড় মাপের। বয়স্ক বিকেলে বাড়ি থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে মিশ্রজী আমন্ত্রণকারীর বাড়ি গেলেন। এ-কথা সে-কথা বলার পর উঠে এল গলদা চিংড়ির মনোহারিণী প্রসঙ্গ। আর যায় কোথা! অধিক বিলম্বে সময় নষ্ট না করে শৈলেন বলেই ফেললেন, গলদা চিংড়ির পদটা আর আছে নাকি। তোমার যা আয়োজন তাতে তো বাড়তি থাকার কথা। আমি খেয়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। আমাকে একটা প্যাকেটে করে গোটা কয়েক গলদা চিংড়ি দাও তো, বাপু। রাতে খেতে হবে। খুব ভালো.... খুব ভালো রান্না! তুমি তো লোককে ভালো খাওয়াতেই ভালোবাসো। এই কথাগুলো শুনে ভোজদাতার অবস্থা 'জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা'র মতো। দুটোর জায়গায় চারটে গলদা চিংড়ি প্যাকেটে ভরে তিনি শৈলেনের হাতে ধরিয়ে

দিলেন। 'আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে...'। মানতেই হয়, শৈলেন ছিলেন প্রবলভাবে জীবন রসিক। সহজ কথা সহজ ভাবেই বলতে পারতেন। ছল-চাতুরির কোনওরকম প্রশ্রয় কখনও তাঁর জীবনাচরণে বিন্দুমাত্র দেখিনি।

দু-একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুলে ধরছি। শৈলেন আমাকে 'দেবুদা' বলেই ডাকতেন। বিগত ১৯৬৯ সাল থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। ওঁদের বাড়ির সঙ্গে পরিচয়। ওঁর ভাই চাঁদুর সঙ্গে টেনিস বলে ক্রিকেট খেলেছি। কড়িদা, কৃপা, স্বপন আর আমি শীতেল সন্ধ্যায় 'পুঁথিঘর' বইয়ের দোকানের সামনে ফাঁকা জায়গাটায় নেট টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলেছি। কখনও সখনও যোগ দিতেন শৈলেন। কোনও জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকা বা গল্প করা শৈলেনের ধাতে দিল না। শৈলেন আমার বিয়েতে বরযাত্রীর দলেও ছিলেন। বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই ধূমপান করতে শিখেছিলেন। তাঁর দেখাদেখি খুড়তুতো ভাই প্রায় সমবয়স্ক মদন ধূমপানে 'ব্রতী' হলেন। পরবর্তীকালে ধূমপান ছেড়ে শৈলেন খৈনি খেতে শুরু করলেন। ধূমপান ও খৈনি খাওয়া থেকে বিরত করতে আমি অজস্র বার তাঁকে সতর্ক করেছিলাম। শেষে এমন অবস্থায় এসেছিল যে হয়তো বাঁ-হাতের তালুতে খৈনি ডলতে ডলতে পথে হাঁটছেন। ওঁকে দেখে আমি ডাকা মাত্র বাঁ-হাতের মুঠো লুকিয়ে বা পকেটে ভরে নিতেন। দুঃখের বিষয়, শেষ দিন পর্যন্ত শৈলেন খৈনি ছাড়তে পারেননি।

গুরুজনপদে প্রণামের মতো শৈলেনের মাতৃদেবীর প্রসঙ্গ একটু উল্লেখ করি। তাঁকে আমি 'মাসিমা' ডাকতাম। স্নেহ করতেন মায়ের মতো। ডাঙ্গালী কালীতলা দিকে গেলেই দেখা করে প্রণাম করতাম। আমার হাতে তুলে দিতেন প্রসাদ। (আপনারা জানেন, চিরকালই প্রসাদে আমার খুব ভক্তি।) গোটা ফল, মন্ডা-মিষ্টি দিতেন। একটি মন্ডায় সিঁদুর লাগা থাকত। আমি সিঁদুরমাথা মন্ডা নিতে চাইতাম না। উনি বলতেন, এটি বৌমার জন্যে দিলাম। এর মর্ম তুমি বুঝবে না, বাবা। তুমি বাড়ি নিয়ে যাও। আমার স্ত্রী ডাঙ্গালী কালীতলায় পুজো দিতে গিয়ে মাসিমার সঙ্গে সময় পেলে দেখা করত। দেখা হলেই এক মুখ হাসি নিয়ে শৈলেন আমার স্ত্রীকে বলতেন- বৌদি, কফি খেতে আপনাদের বাড়ি যাব। এ বছর এক শীত সকালে শৈলেন আমাদের বাড়ি কফি খেতে এসেছিলেন। এ সব কথা, ঘটনাক্রম স্মৃতিপটে মাঝেমধ্যে ভেসে উঠবে।

পরিশেষে বলি, এমএ পাস করার পর চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে শৈলেন আমাকে সাহায্য করেছিলেন। সেটা ১৯৭৮ সাল। চালু হল উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১১-১২ ক্লাস। বেকার অবস্থায় আমি চুটিয়ে টিউশন করছি বোলপুরে। শৈলেনের বড় মেয়ে অনুরাধা, খুড়তুতো ভাই প্রকাশ ও ভাইপো আকাশ আমার কাছে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ নিয়েছে। সেই সময় বোলপুরের একটি সুবিখ্যাত বিদ্যালয়ে চাকরিপ্রার্থী হয়ে আমি আবেদন করলাম। আমার ইন্টারভিউ লেটারটি একই নামের অন্য ব্যক্তির কাছে ডাক বিভাগ পৌঁছে দিয়েছিল। ওই চিঠি তাঁর নয় জেনেও তিনি স্থানীয় ডাকঘরে বা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। অথচ খামের মোড়ক খুলে চিঠির বিষয়বস্তু অবগত হয়েছেন।

তাঁর বাড়ির দরজায় গিয়েও আমি চিঠি হাতে পাইনি। বেশ অসহায়ভাবে শৈলেনকে আমি বিষয়টি বললাম। আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে শৈলেন রীতিমতো চড়া সুরে কথা বলে সেই ব্যক্তির কাছ থেকে চিঠি আদায় করে দিলেন। সেদিনই ছিল ইন্টারভিউ। আমি বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে একাদশ-দ্বাদশ স্তরে খণ্ডকালীন ইংরেজি শিক্ষকের চাকরি পেলাম। এই ঘটনা মনে পড়লে আমি স্বর্গত শৈলেনের উদ্দেশে মনে মনে রবীন্দ্র সংগীত গাই হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর...

বিজয়কুমার দাস স্মরণে

সুজাতা রায়

বাঙলা ভাষা মঞ্চে আপনার সঙ্গে শেষ দেখা বিজয়দা। এর থেকে সুন্দরতর সমাপ্তি আর কিই বা হতে পারতো? এই ভাষাটার হাত ধরেই তো আপনার সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রপাত। একান্ন বছর আগে উনিশশো পঁচাত্তর সালে এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে প্রথম আপনার কাছে নাড়াবেঁধে ছিলাম। রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে' কী বিশাল কবিতা - মুখস্থ আর হয় না। আমি হতোদ্যম,আপনি নাছোড়বান্দা। এরপর কতো কবিতা -ট্যাবলো -শ্রুতিনাটক- ডিবেট আপনার কাছে দিনরাত এক করে তালিম নিয়েছি। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' তে প্রথম আপনার আবৃত্তির সঙ্গে নাচ করেছিলাম। এ বছর তার পঞ্চাশ বছর পূর্তি। রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার'।'কচ ও দেবযানী' আরও কত কী! শেষ ছিল 'শেষের কবিতা',খুব সম্ভবত দুহাজার এক এ আমরা মা মেয়ে মিলে লাবণ্য আর কেটি, আপনি অমিত। এরপর ময়ূরাক্ষী দিয়ে কতো জল বয়ে গেছে। কতোশত ছেলেমেয়ের দল আপনার হাত ধরে আবৃত্তি শিখেছে,অভিনয় শিখেছে - বাঙলা ভাষাটাকে ভালোবাসতে শিখেছে। আমি কিন্তু চিরদিন সবার থেকে নিজেকে এক ইঞ্চি ওপরে রেখে আত্মশ্লাঘা বোধ করেছি কেননা প্রথম সন্তানের মতো প্রথম শিষ্য ও এক অর্থে গুরুর জন্মদাতা। প্রথম সন্তানের মাধ্যমে মানুষ মা বাবা হয় আপনিও কিন্তু আমার হাত ধরেই গুরু হয়ে উঠেছেন। শেষ শয্যায় শুয়েও ক'দিন আগে আপনি যখন আমার কবিতা বোঝার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিলেন - এই বয়সেও শিশুর মতো আনন্দে আত্মহারা হয়েছি। সাংবাদিকতা - লেখালেখি - অভিনয় সংস্কৃতির সব রাজপথেই আপনার অনায়াস গতায়াতের পিছনে একটা সুস্থ সংস্কৃতির প্রতি বলিপ্রদত্ত সত্তা যেন চিরজাগরূক থেকেছে। গত শতকের আটের দশকে আপনার 'বাঞ্ছারামের বাগান' এই ছোট্ট শহরটাকে আমূল নাড়িয়ে দিয়েছিল। আর পাঁচটা মানুষের মতো চাকরি করেছেন - সংসার করেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর অতিথি গল্পের তারাপদ র মতো কিছুতেই বাঁধা পড়েন নি। একাই একটা পত্রিকা কে বছরের পর বছর চালিয়ে নিয়ে গেছেন। কিসের তাড়নায় মানুষ এমন পাগলপারা হতে পারে? এই গেঁও গঞ্জে থেকে কতটুকু খ্যাতি অর্থ প্রত্যাশা করে কেউ! শেষশয্যায় শুয়েও আপনি আবার নাটকের স্বপ্ন দেখেছেন - আধো ঘুমে আধো জাগরণে নাটকের ডায়লগ বলেছেন,গলার আওয়াজ ঠিক আছে কিনা ভেবে ব্যাকুল হয়েছেন। অসহায়ের মত সবাই আপনার একটু একটু করে মিলিয়ে যাওয়া চেয়ে চেয়ে দেখলাম। একটা অর্ধশতকের সম্পর্ককে ঠিক মতো সাজাতে কত হাজার শব্দ লাগে বিজয়দা? আপনার চলে যাওয়ার পর উপলব্ধি করলাম এই কথা গুলো কখনও আগে বলিনি কেন? আজ এই বাতাসে ভাসানো কথাগুলো যদি কোনও অলৌকিক অলিন্দ বেয়ে আপনার কাছে পৌঁছে যায় আপনি হাহা করে হাসবেন কিন্তু বিশ্বাস করবেন,আমি নিশ্চিত।

এতক্ষণে রামধনুর ওপারে মঞ্চ বাঁধা হয়ে গেছে বিজয়দা। আপনি সাজঘরে প্রস্তুতি নিন। আমরাও আসছি।

সাংস্কৃতিক যোদ্ধা বিজয় দাস

ড. পঙ্কজকুমার মণ্ডল

মাথায় বাহারি টুপি, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, কাঁধে সুদৃশ্য ঝোলা, পাজামা-পাতলুন, পায়ে স্লিপার পরিহিত যে মানুষটি সাঁইথিয়ার রাস্তায় হেঁটে অথবা সাইকেলে চড়ে যাচ্ছেন তিনি হলেন সুপরিচিত শ্রী বিজয় কুমার দাস ওরফে বিকুদা (১৯৫৫--২০২৬)। তিনি ছিলেন রাঙামাটি বীরভূমের অন্যতম সাংস্কৃতিক যোদ্ধা। প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীদাস বহুচারী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। বহুল পরিচিতির বহরে অগণন উচ্চারণসমূহ তাঁর কৃতিত্বকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছিল। তিনি সাঁইথিয়ার রক্ষাকালীতলা রোডের 'প্রাণতপস্যা' থেকে প্রায় ৪০ বছর ধরে 'রানার সাহিত্য' পত্রিকা প্রকাশ করে গেছেন। তাতে বহু নামীদামি কলমচিদের পাশে নতুনরাও নিয়মিত স্থান পেয়েছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যজগৎ তাঁকে একডাকে চিনতেন। বিজয় দাস একাধারে সাংবাদিক, কবি, সম্পাদক, নাটককার, প্রাবন্ধিক, গল্পকার ও অভিনেতা ছিলেন। তদুপরি উনি একজন কৃতী পিতা। একমাত্র সন্তান অর্পণ দাস বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। এই সকল কারণে অনেকের কাছেই কর্মকুশলী এই মানুষটি ছিলেন ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।

বীরভূম জেলার মানচিত্রে থিয়েটার চর্চায় বিজয় দাস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন মঞ্চসফল অভিনেতা। শতাধিক নাটক ও যাত্রায় তিনি চুটিয়ে অভিনয় করে গেছেন। যৌবনকালে তিনি সাঁইথিয়ার রঙ্গতীর্থ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় রঙ্গতীর্থের ভালো নাম ডাক ছিল। পরবর্তীকালে মূলত তাঁর নেতৃত্বে তৈরি হয় 'সাঁইথিয়া আসর নাট্যম'। সত্যি কথা বলতে কি, প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে নাটকের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিলেন। বহু মঞ্চসফল নাটক এই সদা নিয়মনিষ্ঠ কুশীলবের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়েছে। সুদক্ষ সংগঠক এবং শৃঙ্খলাঋদ্ধ পরিশ্রমী মানুষ হিসেবে তিনি সুবিদিত। পেশায় ছিলেন অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক; সেই সূত্রে তিনি হতে পেরেছিলেন সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক। নাটককে অবলম্বন করে গোটা পশ্চিমবঙ্গ তিনি চষে বেরিয়েছিলেন। মূলকথাটি হলো নাটক তার মজ্জানিহিত চেতনায় বাহিত ছিল। একজন বাচিকশিল্পী হিসেবে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। বেশ কয়েকটি বাংলা চলচ্চিত্রেও তাকে অভিনয় করতে দেখা গেছে।

সাংবাদিক বিজয় দাসকে নিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় কোটাসুর আশ্রম থেকে প্রকাশিত সমর্পণ ও সন্তু সেনগুপ্তের 'সাপ্তাহিক দিদিভাই' সংবাদ পত্রিকার তিনি ছিলেন প্রধান পুরোহিত। জেলার বহু অনালোচিত বিষয় তাঁর কলমে উঠে আসত। সিউড়ি থেকে প্রকাশিত স্বপন রায়ের 'আননায়ুধ' নাট্য পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় তাঁর নাট্যালোচনা প্রকাশ পেত। এছাড়া কাঞ্চন সরকারের নয়াপ্রজন্ম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সহ আজকাল, সুখবর, ওভারল্যান্ড, সংবাদ প্রভৃতি দৈনিক সংবাদপত্রে তাঁর প্রতিবেদন প্রকাশিত হত। সহজ সরল ভাষায় তিনি কবিতা লিখতেন। বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থেরও তিনি স্রষ্টা। তাঁর কবিতায় একটা গল্প থাকতো। গল্পকার হিসেবেও তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। চেনাজানা পরিবেশ ছিল তাঁর গল্পের বিষয়-আশয়। 'প্রতিভার আলোয় তারাশঙ্কর' বইটিসহ জেলার সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থগুলি তাঁর জাতকে চিনিয়ে দেয়। সাহিত্যের সব ক্ষেত্রেই বিজয় দাসের ছিল অবাধ বিচরণ। তিনি বিচিত্র বিষয় নিয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অনর্গল লিখে যেতে পারতেন। কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে আমৃত্যু লিখে

গেছেন।তাঁর গ্রন্থগুলি হলো --

ক. গদ্যগ্রন্থ - ১।সুজন এবং আরো কয়েকজন

২।কথা ছিল

খ. পদ্যগ্রন্থ - ১।ভালোবাসার কথামালা

২।বেদনার কথামালা

৩।দিনবদলের কথামালা

গ. নাটক - ১।রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন-এর নাট্যরূপান্তর 'রাজরক্ত', ২। অণুনাটক, শ্রুতিনাটক

ঘ. বীরভূমকেন্দ্রিক গ্রন্থ - ১।বীরভূম দর্পণ

২।হাতের মুঠোয় বীরভূম

ঙ. সাহিত্য সমালোচনা ও জীবনী গ্রন্থ - ১।নিবেদন

২। আলোচনার আলোয় মালিনী - ৩। প্রতিভার আলোয় তারাশঙ্কর

চ. সম্পাদিত গ্রন্থ - ১।পাঁচকাহন, ২।বিবেক বন্দনা

এরকম একজন পুরোধা ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে সাঁইথিয়ার সাংস্কৃতিক কর্মীরা গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর শূন্যতা পূর্ণ হতে অনেকটা সময় লাগবে।বোধকরি ভবিষ্যতে জেলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা করতে গেলে বিজয় কুমার দাসের নাম একবাক্যে উঠে আসবে।তিনি কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও সাঁইথিয়াবাসীর হৃদয়ে একটা স্থান করে নিয়েছেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই একজন ক্ষুদ্র উত্তরসূরি হিসেবে শ্রীদাসকে কুর্নিশ করি, সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।বিজয়দা, আপনি ভালো থাকুন পরলোকে।

প্রথিতযশা নাট্যকার বিজয় দাস স্মৃতিচারণা

মৌসোনা দাস

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো আপনার চলে যাওয়ার খবর শুনে।মনে পড়ছে এই তো সেদিন বোলপুরে প্রতিভাদির কবিতা উৎসবের দিন সাঁইথিয়া থেকে যাবে এমন চেনা কাউকে খুঁজছিলাম,যেহেতু আগে কোনোদিন একা যাইনি।স্টেশনে গিয়ে আপনাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম।যাওয়ার সময় টিকিট আপনি দিলেন,ফেরার সময় আমি টিকিট কাটবো বললে আপনি খুব হাসলেন, বললেন আচ্ছা বেশ। কিছুদিন আগে সুবিনয় দাস কিছু বই পাঠিয়েছিলেন আমার জন্য আপনার হাত দিয়ে। বাপ্পাদিত্যদার অনুভূতির ডানা কবিতা উৎসব থেকে সুজাতাদির গাড়িতে ফিরলাম আমরা।কত গল্প হয়েছিল সেদিন কাকিমার কত প্রশংসা করলেন আপনি।অকপটে বললেন, "তোমার কাকিমা খুব ভালো তাই আমার মতো মানুষকে এতদিন ধরে সহ্য করেন।" কত সহজ ভাবে অর্ধাঙ্গিনী কে সম্মান দিতে পারতেন! মনে পড়ছে আপনার সেই প্রাণখোলা হাসি।

আপনি যে আমাদের খুব কাছের মানুষ ছিলেন, কত অজানা তথ্য জেনেছি আপনার কাছে থেকে, প্রচুর জ্ঞান আর একরাশ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার যে মানুষটি সাঁইথিয়া তথা বীরভূম জেলার সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণপুরুষ তিনি আজ হঠাৎ করেই পাড়ি দিলেন না ফেরার দেশে! মৃত্যু প্রকৃতির নিয়ম হলেও কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া কঠিন।আমাদের সাঁইথিয়ার মানুষদের আরো অনেক আবদার ছিল আপনার কাছে।আপনাকে ছাড়া কিছুদিন ধরেই সাংস্কৃতিক মঞ্চ গুলো বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগতো।আপনি অসুস্থ হয়ে ছিলেন জেনেছি।কর্কট রোগ বাসা বেঁধেছিল আপনার শরীরে। সবকিছুর মতোই এরোগও দ্রুত প্রভাব বিস্তার করলো আপনার ওপর। সুস্থ হয়ে ফিরে এসে একটা নাটক মঞ্চস্থ করার কথা বলেছিলেন নিকটজনদের কাছে। জীবনের ওপারে হয়তো মঞ্চস্থ হবে সেই নাটক। আপনার খুব কাছাকাছি মানুষ নারায়ণদা, অরুণদা, নাসিমদা হয়তো আবার একই মঞ্চে আলো করে বসবেন। সাংবাদিকতা,সাহিত্য সাধনা,

অভিনয় থেকে গ্রন্থাগারিক পেশা যাপন সব ধারাতেই ছিল আপনার সাবলীল বিচরণ ।অসংখ্য সংস্কৃতি ধারায় বয়ে চলা ছেলে মেয়েদের মুখে শব্দ যোগান দিয়েছেন আপনি। শিখিয়েছেন সঠিক ভাব ও ভাষার প্রয়োগ। সঞ্চলনার ক্ষেত্রেও আপনার জুড়ি মেলা ভার ।যুক্তিতর্ক থেকে সাংস্কৃতিক মঞ্চ,আবৃত্তিকার থেকে প্রাবন্ধিক সর্বত্রই আপনার পরিপূরক আপনিই ।সুমিষ্ট ও সাবলীল কণ্ঠস্বর অনন্য।

নাট্যকার বিজয় দাসের জীবনের কিছু তথ্য ঃ

(তথ্য সংগ্রহে বিশেষ ঋণ কবি সাহিত্যিক সুজাতা রায়ের কাছে ।)

জন্ম ৫ই জানুয়ারি ১৯৫৫ । স্কুল জীবনে পড়াশোনা সাঁইথিয়া টাউন হাইস্কুল থেকে। প্রথমে সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা। গ্রাজুয়েট অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয় থেকে। পরবর্তী কালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ। প্রথমে সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা ।সায়েন্স গ্রাজুয়েশন এর পর বাঙলায় অনার্স এবং এম.এ। তারপর লাইব্রেরী সায়েন্স নিয়েও মাস্টার্স বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

পেশাগত জীবনে প্রথমে সাংবাদিক এবং সাঁইথিয়া অভেদানন্দ কলেজের গ্রন্থাগারিক ছিলেন।

উনপঞ্চাশ বছর ধরে একার প্রচেষ্টায় যথেষ্ট গুণমানের 'রানার' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

তাঁর লেখা গদ্যগ্রন্থ ঃ ১/সুজন এবং আরো কয়েকজন, ২/ কথা ছিল।

পদ্যগ্রন্থ ঃ ১। ভালোবাসার কথামালা, ২। বেদনার কথামালা, ৩।দিনবদলের কথামালা।

নাটক ঃ ১। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন-এর নাট্য রূপান্তর 'রাজরক্ত', ২।অণুনাটক শ্রুতিনাটক

বীরভূমকেন্দ্রিক গ্রন্থ ঃ ১। বীরভূম দর্পণ, ২। হাতের মুঠোয় বীরভূম

সাহিত্য সমালোচনা ও জীবনী গ্রন্থ ঃ ১। নিবেদন, ২। আলোচনার আলোয় মালিনী, ৩। প্রতিভার আলোয় তারাশঙ্কর

পাঁচকাহন (সম্পাদিত) , বিবেক বন্দনা (সম্পাদিত)।

নারায়ণ কর্মকার-কে

অরুণাভ সেনগুপ্ত

আস্তিনে লুকানো থাকত পোষা বর্ণমালা
শব্দে শব্দে বুনে দিতে তাদের পোষাক
বাউলের বর্ণময় জোব্বাটি নিখুঁত
সুরের ইন্দ্রজালে জুড়ে দিতে ডানা
পোষা পাখি হয়ে তারা দিব্যি থাকত বসে
তোমার প্রাণের মাঠে, কণ্ঠের উঠোনে।
খেলা করত সাতটি সুর সাতটি পোষা পাখি
বাউল প্রাণের সুর উড়ে যেত অনিবার্য বহমানতায়..।

তুমি হেঁটে হেঁটে এলে
আমি দেখি হেঁটে আসছে
আস্ত এক গানের দেউল।
ভালবেসে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরলে
শব্দের কারুকাজ ডুবকি হয়ে বেজে উঠত
সুর সব বেজে উঠত একতারা খমকে...

এরকমই হাঁটতে হাঁটতে হে প্রিয় সুজন
আমাদের হাত ছেড়ে কোথায় এগিয়ে গেলে
ডাক দিল কোন্ গান,গানের অন্তরা..।
গানের দেউল খুঁজি..
শব্দ থাকে ছন্দোবদ্ধ, সুর পরিপাটি
দেউলের বিগ্রহটি অন্তর্হিত হয় শুধু
মিশে যায় আমাদের প্রাণের গভীরে..।।

With Best Compliments from :-

JAGANNATH KARMAKRA

Febrication Contractor, Gate, Grill, Shutter
all type of Iron Structure Shed Order Supplliers

GSTIN - 19ANRPK3695B1ZL

Mob. No. : 9732373889 / 9153282414

ILLAMBAZAR (JOYDEB ROAD) BIRBHUM, PIN - 731214, (W.B.)

PrintedbBy: Chandidas Press, Dubrjapur (Power House More) Birbhum
9735185690 7029031419 nafisa13dcm@gmail.com